জাকির নায়েকের বিরোধীতা কেন?

সম্পাদনায়

মাওলানা রফিকুল ইসলাম এম, এম,

Scan by
http://unityofmuslimummah.wordpress.com/

জাকির নায়েকের বিরোধীতা কেন ?

মাওলানা রফিকুল ইসলাম এম, এম,

জাকির নায়েকের বিরোধীতা কেন?
মাওলানা রফিকুল ইসলাম এম. এম

প্রকাশক
মাওলানা রফিকুল ইসলাম এম. এম

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর-২০১১

কম্পোজ
বর্ণমিছিল কম্পিউটার
১২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান
ইসলাম পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৩৬-১১৮৩৯৯

হাদিয়া : ৪০.০০ টাকা মাত্র

লেখক পরিচিতিঃ

মোঃ রফিকুল ইসলাম ভারতের আসাম প্রদেশের সাবেক গোয়াল পাড়া বর্তমান ধুবরী জেলার তামার হাট থানার অর্ন্তগত ঘৃতিঙ্গার কুটি গ্রামে ১৯৭১ খ্রীঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। দাদা মৃত আবেদ আলী হাজী বাংলাদেশের বৃহত্তম ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর হতে ভাগ্যোন্যাসান ভারতের আসামে হিতু হন। পরবর্তীতে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্য গমন করে পবিত্র নগরী মদীনায় মৃত্যু বরণ করলে পুত্র আব্দুল লতিফ তাঁর সহোদর পাঁচ ভাই ও তিন বোনকে ভারতে রেখে ১৯৬৩ খ্রিঃ পাকিস্থানি শাসন আমলে হিন্দুদের সাথে বিনিময় কৃত বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ঠিক রাখার জন্য ১৯৮০ খ্রীঃ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কাতলাসেন গ্রামে প্রত্যাবর্তণ করেন আমৃত্যু তিনি এখানেই স্থায়ী হন। পাঁচ ভাইও পাঁচ বোনের মধ্যে লেখকের অবস্থান পঞ্চম।

ইতিহাস খ্যাত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কাতলাসেন কাদেরীয়া কামিল মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে হাদীস বিভাগে ১৯৯৯ খ্রীঃ কামিল সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা উপেক্ষা করে নিরত থাকেন ধর্মতত্ত্বের গবেষনায়। এর আগে প্রকাশিত মৌলিক গবেষনা গ্রন্থ "তাসাউফের মর্মকথা ও মারিফাতের ভেদ তত্ত্ব"প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থটি তাওহীদ বাদী বোদ্ধা পাঠক ও সমালোচক হতে ব্যপক ভাবে প্রশংসিত হয় । এছাড়া আরো বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। ভ্রুমন পিপাসু বিজ্ঞান মনস্কতা ও অগ্রসর চিন্তক হিসেবে পরিচিত মহলে রয়েছে তাঁর ব্যপক খ্যাতি। অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা,দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে গভীর দখল ও সাহসীক উচ্চারণে তিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব।

ভন্ডামী ও সটতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী পুরুষ। সুবক্তা হিসেবেও রয়েছে তাঁর ব্যপক পরিচিতি। ব্যক্তি জীবনে চার সন্তানের জনক। পরলোকগত বাবা আব্দুল লতিফ, মা' মমিনা খাতুন ও নানা আব্দুস সবুর মুন্সি ছিলেন প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বব্যাপি ইসলাম ও মুসলিমদের ঈমান আক্বীদা বিনষ্ট করায় জন্য ইহুদী খৃষ্টান ও ভারতীয় পৌত্তলিকরা তাদের দেয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতিয়তাবাদ, বৈরাগ্যবাদ তথাকথিত মুসলিম নাম ধারী রাজনৈতিক নেতা ও মিডিয়াগুলোর সহযোগিতায় প্রচার করছে। মুসলিম নাম ধারী এসব নেতাদের দ্বারা তৈরী হচ্ছে অগণিত মুর্তি ভাষ্কার্য যেখানে নগ্নপদে ফুল দিয়ে পৌত্তলিকদের সমর্থন দেয়া হচ্ছে। আবার ধর্মের নামে ইসলামি পোষাক পরে তথাকথিত মুখোশধারী কতিপয় আলেম কুরআন হাদীস বিকৃত করে খৃষ্টান বৌদ্ধ ও বেদান্ত মতবাদের দ্বারা তৈরীকৃত সুফীমতবাদ এর দাওয়াত অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করছে। তাদেরই অনুকরণে কুরআন হাদীস বিকৃত করে জাল হাদীস ব্যবহার করে খৃষ্টান, বৌদ্ধ বেদান্ত, হেন্দু বৈষ্ণবদের দেবতা শ্রী চৈতন্যের ভক্তিবাদ ও সুফী মতবাদের প্রচার করে যাচ্ছে বাউল ফকীরের দল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চিত্র জগতের নায়ক নায়িকা, গায়ক গায়িকাদের চরিত্রের অবক্ষয় ঘটলেও তারা কুরআন হাদীস এর দোহাই দিয়ে এসব করেনা। কিন্তু বাউল নেড়া ফকীরের দল পঞ্চরস ভক্ষণ করে নারী পুরুষ একত্র হয়ে কুরআন হাদীসের দোহাই দিয়ে মুলত হিন্দু দেবতা চৈতন্যর ভক্তিবাদ ও ভ্রান্ত সুফীবাদ প্রচার করছে। উক্ত ভ্রান্ত সুফী মতবাদ ও বাউল মতবাদ এবং বিজাতীয় মতবাদের প্রচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করে আসছে মুসলিম নামধারী রাজনৈতিক দুরন্তর ব্যক্তিবর্গ ও মিডিয়া। যার ফলে মুসলমানরা আজ শিরক বিদআতে নিমজ্জিত হয়ে তাদের জাতি সত্ত্বাকে হারাতে বসেছে। মুসলিমদের এই দুর্দিনে তাদের ঈমান আক্বীদা রক্ষা এবং বিজাতীয় মতবাদ ভ্রান্ত সুফী ও বাউল মতবাদ থেকে রক্ষার্থে বিশ্বে একজন মুসলিম নেতা (রাজনৈতিক নেতা হোক আর ধর্মীয় নেতাই হোক) খুজে পাওয়া যাচ্ছে না যে বিজাতীয়দের ও ভ্রান্ত মতবাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিবে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতের মুম্বে শহরে একজন মুসলিম নেতা সংস্কারক এর আবির্ভাব ঘটেছে। যিনি কুরআন হাদীস অধ্যায়ণ করার পাশাপাশি বিশ্বের সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থ অধ্যায়ন করে কুরআনই সত্য ধর্মগ্রন্থ বলে অমুসলিমদের নিকট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। যা বর্তমান কোন আলেমের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি নির্ভেজাল তাওহীদ এর দাওয়াত পেশ করার সাথে অমুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থ মন্থন করে কুরআন সুন্নার কষ্টি পাথরে যাচাই করে অমুসলিমদের নিকট প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, ইসলাম ধর্মই সত্য ও অন্যান্য ধর্ম সত্য মিথ্যায় মিশ্রিত। তার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অঘাত পান্ডিত্ব এবং প্রমান দলীলভিত্তিক বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে শত শত অমুসলিম তাওহীদের কালেমা পড়ে ইসলামের সু-শীতল ছায়া তলে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ধন্য করছে। শুধু তাই

নয় এ ব্যক্তিটি মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ ও নাস্তিক বাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যেই তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছে সেই পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছে। এই বহুবিদ গুণ বিশিষ্ট ব্যাক্তিটিই হলেন ডঃ জাকির নায়েক। যিনি সকল ভ্রান্তমতবাদ থেকে মুসলিমদের ঈমান আক্বীদা রক্ষাকল্পে নির্ভেজাল তাওহীদ এর দাওয়াত তার নিজস্ব মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য মুসলিম নামধারী কতিপয় সুফী আলেম মুসলিমদের চিরশত্রু খৃষ্টান পৌত্তলিক ও ভ্রান্ত মতবাদ এর বিরুদ্ধে কিছু না বলে যিনি ইসলাম ও মুসলিমদের ভালোই কামনা করছেন সেই জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে উঠে পরে লেগেছে। এ শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচারণ নতুন কোন বিষয় নয়, ইসলামের পূর্ব যুগ থেকে এ মুখোশধারী আলেমরাই বড় বড় মনিষীর বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যুগে এই মুখোশধারি আলেমেদের নিকট ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত চাইলে তারা মতামত দেন ইমাম আবু হানিফাকে কারারুদ্ধ করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হোক। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল ইমাম তাইমিয়ার যুগেও এ সব আলেমদের উৎপাত ছিল। অথচ যারাই বিরুদ্ধাচারণ করেছে তারাই ডাষ্টবিনের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে একথা সত্য। সম্প্রতি দুইটি বই আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বই দুইটির লেখক মাওঃ মাওঃ মাওঃ মাওঃ মাওঃ নুরুল ইসলাম ওলীপুরী ও মুফতি মিজানুর রহমান কাশেমী। বই দুইটির নাম করণ করা হয়েছে-**"জাকির নায়েকের আসল চেহারা" "জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ"** বই দুইটিতে জাকির নায়েককে, ভ্রান্ত সালাফীবাদ ভ্রান্ত মওদূদীবাদ, লা মাযহাবী, অজ্ঞমূর্খ ইত্যাদি ভাষায় গালি দেয়া হয়েছে। তার সম্পর্কে কিছু অভিযোগও পেশ করা হয়েছে। তাই মুসলিম ভাইদের কাছে বই দুইটির লেখক নরুল ইসলাম ওলীপুরী ও মুফতি মিজানুর রহমান কাশেমীর স্বরূপ এবং জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ গুলো খন্ডন করে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। যাতে করে পাঠকদের জাকির নায়েকের ব্যপারে সন্দেহের অবসান ঘটে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি কোন উম্মত ঐসব ভ্রান্ত মতবাদ থেকে ফিরে আসে তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি

লেখক

মাওঃ নুরুল ইসলাম ওলীপুরী ও মুফতী মিজানুর রহমান কাশেমী কে?

নূরুল ইসলাম ওলীপুরী ঢাকা লালবাগ কওমী মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাশ আর মুফতী কাশেমী হলো- শায়খুল হাদীস আজিজুল হক সাহেবের প্রতিষ্ঠান জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার মুফতি। পরবর্তীতে তাবলীগ ও পীর ভক্তদের নিকট ওলীপুরী সাহেব মুফাচ্ছির মুনাযিরে জামান আর কাশেমী সাহেব মুফতিএ আজম উপাধিতে ভূষিত হন। যদিও ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব দেশের বিশেষ কোন আলেমদের সাথে মুনাযারা করেন নি। তবে ওলীপুরী সাহেব মুনাযারা করেছে নেত্রকোনার ব্রেলভী গ্রুপের ভ্রান্ত আলেম আলী হুসেন রেজভীর সাথে। তাও আবার কুরআন হাদীস এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার জন্য নয়, মুনাযারা হয়েছে ইলিয়াসী তাবলীগ ও দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার কারণে। উল্লেখ্য যে, ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব হলো ইলিয়াসী তাবলীগ ও দেবন্দীদের ভক্ত। ব্রেলভী ও দেওবন্দী উভয় দলের আক্বীদাই ভ্রান্ত। আক্বীদার দিক দিয়ে মনে হয় দেওবন্দী ও ব্রেলভী এ দুইটি ভ্রান্ত মতবাদই এক মায়ের দুটি জমজ সন্তান। তাই বলা চলে ওলীপুরী সাহেব রেজভীর সাথে বাহাস বা মুনাযারা করা যেন নাপাক দিয়ে নাপাক ধৌত করা। যা কখনো পাক হওয়ার নয়। ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব মুনাযিরে জামান ও মুফতি আজম হলেও তাদেরই মাযহাবের পীর জিল্লুর রহমান রাজারবাগী ইলিয়াসী তাবলীগ ও দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে মুনাযারার যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ কিন্তু তাবলীগ ও দেওবন্দী ভক্ত ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব গ্রহণ করতে পারে নাই। যে ব্যক্তিরা সূফীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে না। তারাই নাকি তাওহীদবাদী জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে কথা বলে। এখানে বলা আবশ্যক যে, ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব মূলত দুটি ভ্রান্ত আক্বীদার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। একটি হচ্ছে দেওবন্দী অন্যটি হচ্ছে ব্রেলভী। ব্রেলভীদের ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে উপমহাদেশের অনেকে সতর্ক থাকলেও দেওবন্দীদের ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে লোকজন সতর্ক নয়। কেননা সাধারণ লোকজন তাদের লেবাছের দিকে আকৃষ্ট হয়ে তাদের সম্পর্কে সু-ধারণা রাখে। অথচ তাদের লেবাছের ভিতরে ভ্রান্ত আক্বীদা লুকায়িত আছে। তা জ্ঞানীদের জানা থাকলেও সাধারন মানুষের অজানা। দেওবন্দী আক্বীদাও ইলিয়াসের স্বপ্নের ধর্ম তাবলীগের ভ্রান্ত আক্বীদার দাওয়াতের প্রধান দাঈ হলেন এই ওলীপুরী ও কাশেমী ।

প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে ওলীপুরী/ কাশেমী ও জাকির নায়েক

ওলীপুরী ও কাশেমীর আক্বীদা, আমল, আদর্শ ও চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো জাকির নায়েকের আক্বীদা, আমল, আদর্শ ও চিন্তা। ওলীপুরী ও কাশেমী কুরআন হাদীসের নামে তথাকথিত দেওবন্দী বেরলভী সুফী মতবাদের দাওয়াত দেয়। আর জাকির নায়েক কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়। সাথে সাথে বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাবলী কুরআন সুন্নার কষ্ঠি পাথরে জাচাই করতঃ চুলচেরা বিশ্লেষন করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের কে তাওহীদ এর দাওয়াত দেয়। জাকির নায়েক কুরআন হাদীসের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ মন্থন করে তার সারনির্জাস রেফারেন্স সহ সকল মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিচ্ছে। কেননা আল্লাহপাক নিজে রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে বলেছেন। (সূরা ইউসুফ-১০৮) যাতে মানুষের মাঝে দ্বিধা দ্বন্দ সৃষ্টি না হয়। যা ওলীপুরী ও কাশেমীর মত এক কেন্দ্রীক আলেমের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এপর্য়ন্ত ওলীপুরী ও কাশেমীর অনেক লেখায় আমরা দেখেছি তাতে রেফারেন্স নেই বললেই চলে। তবে তাদের লেখাতে বিদআতী কথা ভরপুর। তা আমারা পরে বর্ণনা করব। কাজেই কুরআন সুন্নার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের জ্ঞান কোন এক রোখা এক কেন্দ্রিক আলেমরা অর্জন করতে সক্ষম নয়। ফলে এরকম আলেমদের জন্য বহুবিদ জ্ঞান প্রচার করা দুরহ ব্যপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কুরআন বর্হিভূত বিশ্বাসী আলেমদের প্রভাব প্রতিপত্তি যখন জাকির নায়েকের মত একজন ডাক্তার কর্তৃক কুরআন হাদীসের বাণী শুনে সাধারণ মানুষ তাঁর দিকে ঝুকে পড়ে এবং উক্ত আলেমদের প্রভাব হারাতে শুরু করে। তখন যে আলেমরা নিজেদের আমিত্বকে প্রকাশ করার জন্য, দিক বেদিক না দেখে পাগলের মত প্রমাদ গুণতে থাকে। তারই বহিঃপ্রকাশ ওলীপুরী ও কাশেমীর লেখা "জাকির নায়েকের আসল চেহারা" ও জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ নামক বই দুইটি। পাঠক বই দুটির নাম দেখেই বুঝা যায় এটি জাকির নায়েকের উপর বিদ্বেষ পোশণ বা নিন্দা করে লেখা হয়েছে। এ নিন্দায় জাকির নায়েকের কি-বা ক্ষতি হবে? যারা আল্লাহর পথে কথা বলে তারা নিন্দুককে ভয় করে না। (সূরা মায়েদা-৪৫) জাকির নায়েক সমকালীন সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশ্বজুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তখন ওলীপুরী ও কাশেমীর মত এক কেন্দীক সুফী আলেমদের জাকির নায়েকের বিশ্বজোড়া খ্যাতির উপর কি প্রভাব ফেলবে? এ যেন সাগরের সাথে ঝিনুকের লড়াই। নির্বোধ পশু মনে করেছিল তার সামনের বিরাট পাহাড়টিকে তার ছোট শিং দিয়ে ধ্বংস করে ছাড়বে। কিন্তু সে পাহাড়কে ধ্বংস করতে গেলে তার নিজের জীবনই যে বিপন্ন হবে, সে চিন্তা নির্বোধ পশুর কোনদিনই ছিল না। তেমনি জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে বিষোদগাঢ় করে ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেবদের সব ঝাড়িঝুড়ি ফাঁস হয়ে যাবে। সে চিন্তা ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেবদেরও ছিল না। ফলে ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেবরা সেই নির্বোধ পশুর মতই জ্ঞানহীনের পরিচয় দিয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

জাকির নায়েকের উপর ওলীপুরীর অভিযোগ

ওলীপুরীর লেখা জাকির নায়েকের আসল চেহারা নামক গ্রন্থে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ এনেছেন। সে অভিযোগগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে খন্ডন করব ইনশাআল্লাহ।

১ নং অভিযোগ ঃ জাকির নায়েক অনারোব ভাষায় তথা মাতৃভাষায় জুম'আর খুৎবা দেওয়ার পক্ষে ফতোয়া দেন। অথচ মাতৃ ভাষায় খুৎবা দেওয়াই সুন্নাত। নবীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি তখন তাঁকে তাঁর স্বজাতির মাতৃ ভাষাতেই পাঠিয়েছি। (সূরা ইবরাহীম-০৪)। রাসূল (সঃ) এর মাতৃভাষা যেহেতু আরাবী ছিল এবং সাহাবীদেরও মাতৃভাষা আরাবী ছিল সেহুতু তিনি আরবীতেই তাদের নসীহত করতেন। এই নসিহতে আদেশ নিষেধ উপদেশ সবই ছিল। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) খুতবা দেওয়ার সময় দেখেন যে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) মসজিদের বাইরে রয়েছেন, তখন রাসূল (সাঃ বলেন, হে ইবনে মাসউদ এগিয়ে আস। (আবুদাউদ-১/২৮৬) অন্য বর্ণনায় রাসূল (সাঃ) সাহাবী আবু হাযিমকে রোদ্রে দাঁড়িয়ে দেখে রাসূল (সাঃ) ছায়ায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। (আবুদাউদ-১/২৫৭) আরেক বর্ণনায় রাসূল (সাঃ) খুতবা দেওয়া কালীন এক ব্যাক্তি মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে আসছিল। তখন রাসূল (সাঃ) বলেন, তুমি বসে পড়। তুমিতো দেরি করে এসেছ আবার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ। (আবুদাউদ-১/২৯২) উমর (রাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন- এসময়ে এজন মস্‌জিদে প্রবেশ করেন। উমর (রাঃ) খুতবা থামিয়ে বলেন। এত দেরি হলো কেন ? ঐ ব্যাক্তি বললেন- কাজে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছিলাম আজান শুনে অজু করেই চলে এসেছি। উমর (রাঃ) বলেন- শুধু অজু করে ? রাসূলতো (সাঃ) জুম'আর দিনে গোসল করতে বলেছেন। (বুখারী-১/৩০০, ৩১৫) এরুপ আরো অনেক হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা খুতবা থামিয়ে ব্যাক্তিগতভাবে মুসল্লীদেরকে অন্য প্রসংঙ্গে কিছু বলে আবার খুতবা শুরু করতেন। উপরের বর্ণনা গুলো থেকে সহজে বুঝা যায় যে, খুতবার মধ্যে ওয়াজ ছাড়াও ব্যাক্তিগত ভাবে কোন কোন মুসল্লীকে ডেকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া রাসূল (সাঃ) সুন্নাতের অংশ। এ সহজ বিষয়টি ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেবদের বুঝে ধরেনা। উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু বাকর সারাখসী বলেন- "খুতবা নামযের মত নয়" নামাযের অর্ধেকের স্থালাভিষিক্ত নয়। তার প্রমাণ হলো কথাবার্তা বললে তা নষ্ট হয় না। (সারাখসী, মাবসূত- ২/৩২০) আর ওলীপুরি

বলেন- "খুতবা নামাযের অর্ধেক" হানাফি ফকীহগণ বলেন- আরবীতে খুতবা দেওয়া মস্তাহাব। অনারোব ভাষায় তথা মাতৃভাষায় খুতবা দেওয়া যায়েজ। (আলফিকহুল আলালা মাযাহিবিন আরবা'য়া-১/৩৫৫) এতে প্রমাণিত হয় খতীবের মাত্রভাষায় খুতবা দেওয়া উত্তম তা না হলে বাংলা ভাষার মুসল্লীদেরকে খতীব সাহেব আরবীতে কিছু উপদেশ দিলে মুসল্লীরা বুঝবে কি করে ? অতএব যারা রাসূল (সাঃ) এর নায়েব হয়ে জুমআর খুৎবা দিবে তাদেরকে অবশ্যই উল্লেখিত আয়াত অনুসারে তাদের শ্রোতাদের মাঝে মাতৃ ভাষায় খুৎবা দিতে হবে। এটাই শরীয়ত সম্মত। তা না হলে খতীব সাহেব যদি আরবীতে তোতা পাখির মত খুৎবা পড়েন এবং তার শ্রোতারা যদি আরবী না জানেন তাহলে তারা খতীবের নসীহত বুঝতে না পারার ফলে অমনোযোগী হতে বাধ্য। ইমাম শাফেয়ী বলেন প্রত্যেক খতীবকে জুমআর সময় তার মাতৃ ভাষায় ওয়ায করা ওয়াজিব (তানকীহুর রুওয়াত)। ওলীপুরী **জাকির নায়েকের আসল চেহারা গ্রন্থের** ৯ পৃঃ বলেনঃ দেড় হাজার বছরের ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ অনারবি ভাষায় জুম'আর খুৎবাকে অবৈধ বলেছেন। ওলীপুরীর জবাবে আমরা হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবীর ফতোয়াটি তুলে ধরছিঃ হানাফী বিদ্যান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী বলেন শ্রোতাদেরকে তাদের ভাষায় খুৎবা বুঝিয়ে দেওয়া জায়েয। (মজমুআহ ফতোয়া-২২৪,২২৫)। দেখলেন তো হানাফী আলেম লাক্ষ্ণৌবী কি ফতোয়া দিলেন ? ওলীপুরী ও কাশেমী লাক্ষ্ণৌবীর ফতোয়া জানেন না। ওলীপুরী ও কাশেমীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনাদের হানাফী ফিকাহ্ গ্রন্থ নিহায়া, মুজতাবা, ফতোয়ে সিরাজিয়া, মুহীত প্রভৃতিতে আছে যে, ইমাম আবু হানিফার মতে ফারসী ভাষাতে জুমার খুৎবা দেওয়া জায়েয। শামীতে আছে আরবীতে খুৎবা দেওয়া শর্ত নয়। হেদায়ায় আছে , প্রত্যেক ভাষায় খুৎবার নাসীহত চলতে পারে। (কিতাবুল জুমআ) যারা হেদায়ার মাসআলা জানে না তারা দেড় হাজার বছরের খবর নেয়। এ যেন অন্ধকে হাতি দেখানোর মত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কঠিন ভাষা প্রদর্শন কারী ধ্বংস হয়ে যাক। এ কথা তিনি তিন বার বলেন। (মুসলিম)। হানাফী মাযহাবের কিতাবে আছে-"নামায শুরু করার সময় আল্লাহ আকবার না বলে, আল্লাহ আজম, আররাহমানু আকবার অথবা ফারসী ভাষায় আল্লাহ বুর্জগাস্ত বলে হাত বাঁধলে তার নামায শুদ্ধ হবে। (হেদায়া ১ম খন্ড-৮৪ পৃঃ) ফারসী ভাষায় নামায পড়লে দোষ নেই। বাংলা ভাষায় খুৎবা দিলে বড় দোষ হয়ে যায়- তাই না ? অতএব প্রমাণিত হল- জাকির নায়েকের ফতোয়াই ঠিক এবং কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

২ নং অভিযোগ ঃ জাকির নায়েক কোন আলেম নন। **জাকির নায়েকের আসল চেহারা গ্রন্থের** ৫ পৃঃ অথচ বিশ্বের সেরা সেরা আলেমে দ্বীন হতে বিশেষ করে সৌদি আরবের বাঘা বাঘা আলেমদের কাছ থেকে যোগাযোগ রক্ষা করে তিনি শিক্ষা নিচ্ছেন। জাকির নায়েকের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আরব জগতের এক ঝাঁক নবীন ও প্রবীন মুহাক্কিক আলেমের স্বরব ও উপস্থিতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে রমযান মাসে ডঃ জাকির নায়েকের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য কাবা শরীফের সম্মানিত ঈমাম শায়েখ সুদাইসী প্রাইভেট বিমান নিয়ে ছুটে আসেন এবং অনুষ্ঠান শেষ করে আবার মক্কায় ফিরে যান। ওলীপুরী তার লেখা বইয়ের ২৪ পৃষ্ঠায় আলেমের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন ঃ ইসলামের পরিভাষায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানকে ইলম এবং এই জ্ঞানের অর্জনকারীকে আলেম বলা হয়। দেওবন্দীদের ভ্রান্ত আক্বীদার কথা কুরআন হাদীসে আছে কি ? ওলীপুরীর সংজ্ঞা অনুযায়ী দেওবন্দীরা কেউ আলেমের মাপকাঠিতে পড়ে না। কারণ তাদের হেন ভ্রান্ত ধারণার কথা কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। দেওবন্দীদের আক্বীদা সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। এবার দেখা যাক ওলীপুরী আলেমের সংজ্ঞায় পড়ে কি-না। ওলীপুরী বলেনঃ এরা (সালাফীরা) বলে- পীর মুরীদী ফরজ নয়। (তাসকিয়ায়ে নাফস পৃঃ১৬) মাওঃ ওলীপুরী সাহেবকে বলছি, পীর মুরীদীর কথা কুরআন হাদীসের কোথাও আছে কি ? রাসূল (সাঃ) কি পীর মুরীদী করেছেন ? পীর শব্দটি কি আরবী ভাষা ? এটা সকলেই জানে যে, কাদরীয়া তরীকার প্রর্বতক আব্দুল কাদের জিলানী (জন্ম-১০৭৮ খ্রিঃ) চিশতিয়া তরীকার প্রর্বতক খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি (মৃত্যু-১২৩৬ খ্রিঃ) নকশাবন্দীয়া তরীকার প্রবর্তক বাহউদ্দিন মোহাম্মদ নকশাবন্দী। (মৃত্য-১০৮৯ খ্রিঃ) মুজাদ্দেদীয়া তরীকার প্রবর্তক মুজাদ্দেদে আলফেসানী (মৃত্যু-১৫২৩) উপরোক্ত তরীকা গুলোর জন্ম হয় রাসূল (সাঃ) মৃত্যুর হাজার বছর পরে। যা দশম শতাব্দির শেষ দিকে পীর মুরীদীর নামে চালু হয়। তাহলে এগুলি ফরজ হলো কিভাবে ? ফরজ হলো আল্লাহর হুকুম যা কুরআনে থাকতে হবে। ফরজ হলো রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ যা সহীহ হাদীসে থাকতে হবে। অতএব কুরআন ও সহীহ হাদীসে পীর-মুরীদী ফরজ হওয়া কি করে থাকতে পারে ? তাহলে ওলীপুরী কি করে বলেন পীর-মুরীদী ফরজ ? ওলীপুরী বলেন- জান্নাতে যাওয়ার, আল্লাহকে পাওয়ার, সিরাতে মুস্তাকীমের চারটা অংশ আছে আর তা হলো-শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফত। (তাসকিয়ায়ে নফস পৃঃ ৪২) এটা সকলেরই জানা ওলীপুরীর উক্ত তরীকা গুলো সূফীদের দ্বারাই আবিস্কৃত।

সূফীগণ সূফীবাদের পারিভাষিক কিছু শব্দ ধার করে অর্থ কিছুটা বিকৃত করে সূফী দৃষ্ট অর্থ প্রদান করে এভাবে মিশরী এবং কাররাম আনায়ন করে মারেফাত শব্দ, শাকীক আনায়ন করে তাওয়াক্কুল, তিরমিযি আনায়ন করে বেলায়া এবং বায়েজীদ বৌদ্ধ দর্শণের নির্বাণ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আনায়ন করে ফানা। (ইসলামী বিশ্ব কোষ পৃঃ-১১৪) এগুলো কি কুরআন হাদীসের ইলম ? রাসূল (সাঃ) বলেনঃ এক শ্রেণীর আলেম আমার তরীকা ও আদর্শ ছেড়ে ভিন্ন আদর্শ ও তরীকা গ্রহণ করবে। যাদের অন্তর হবে শয়তানের মত। এবং আকৃতি হবে মানুষের মত। (মিশকাত হা/৫৩৮২) অতএব প্রমাণিত হলো ওলীপুরী নিজেই কোন আলেম নন। জাকির নায়েকই প্রকৃত আলেম।

৩ নং অভিযোগ ঃ জাকির নায়েক লা মাযহাবী অর্থাৎ চার মাযহাবকে ফরজ মনে করেন না। তার জবাব নিম্ন দেওয়া হলো ঃ

প্রথম ফিকহ দল হানাফী মাযহাব ঃ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) (জন্ম ৮০ হিজরী) নিজে কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর ৪০০ হিজরীর পর ইরাকের হামীদ বিন সুলাইমান হানাফী মাযহাবের নাম করণ করেন। পরবর্তীতে 'আব্বাসীয় খলিফাগণ এই মাযহাবের স্বীকৃতি দান করেন (ইসলামের ইতিহাস পৃঃ ৩১২ তাবারেক আলী)। ইমাম সাহেব নিজ হস্তে কোন গ্রন্থও লিখে যাননি। ফিকুহুল আকবর গ্রন্থখানি আবু মুতীব বালখীর লেখা, ইহা দশম শতাব্দিতে লিখা হয়েছে।

দ্বিতীয় ফিকহী দল মালিকী মাযহাব ঃ ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ) (জন্ম-হিঃ ৯৩) স্পেনের খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান, মালিকী মাযহাব অনুসরণ করার নির্দেশ জারি করেন।

তৃতীয় ফিকহী দল শাফিয়ী মাযহাব ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস (রঃ) (জন্ম-১৫০ হিজরী) দলাদলীতে প্রশ্রয়প্রাপ্ত ভক্ত শাগরিদগণই ক্রমশ এ মাযহাবকে স্থায়ীভাবে গড়ে তোলেন।

চতুর্থ ফিকহী দল হাম্বলী মাযহাব ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) (জন্ম ২৪১ হিজরী) তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হাজার হাজার শিষ্য শাগরিদ তাঁর মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ চারটি মাযহাব ছাড়াও আরও কয়েকটি মাযহাবের উদ্ভব ঘটেছিল যা পরবর্তিতে উপরোক্ত চারটি মাযহাবের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। যেমন- ইমাম সুফিয়ান সাওরী,ইমাম হাসান বসরি, ইমাম আওয়াযী- এর মাযহাব। এ তিনটি মাযহাব হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত চালু ছিল। ইমাম আবু সাওর এর মাযহাবও তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল । ঐতিহাসিক ইবনে

খালদুনের খবর মতে ইমাম দাউদ যাহেরীর মাযহাব হিজরী ৮ম শতাব্দি পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া ইসহাক ইবনে রাহওয়ার, সুফইয়ান ইবনে ওয়াইনা, ইবনে জারীর তাবারী, লাইস ইবনে সাদ তাদের মাযহাবও কিছুদিন চালু ছিল। পরবর্তিতে চারটি মাযহাবই টিকে যায়। তাদের অনুস্বারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তাদের আলেমগণ জনসাধারণের জন্য উক্ত চার মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ বা তাক্বলীদ (অন্ধ অনুস্বরণ) করাকে ফরজ বলে ফতোয়া প্রদান করেন। যা ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থনীয় ছিলনা। আবুল ফাৎহ মুহাম্মদ বিন আবুল হাসান ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ) চার মাযহাবের প্রচলিত সহীহ হাদীস বিরোধী ফতোয়া সমুহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করে ছিলেন, যার ভূমিকাতে তিনি ঘোষনা করেন যে, এই মাসআলা গুলি চার ইমামের নামে চার মাযহাবে চালু থাকলেও এগুলোকে তাঁদের দিকে সর্ম্পকিত করা হারাম। এগুলির মাধ্যমে তাঁদের ওপরে মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র যেমনঃ দুররেমুখতারে কুরআন হাদীস বিরোধী পঞ্চাশটি মাসআলা রয়েছে। হেদায়াতে বর্ণিত ১০০ মাসায়েল হাদীস বিরোধী । আল্লামা তাফতাজানী শারাবী , ওয়ালিউল্লাহ দেহলোভী,মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলে একথা স্বীকার করেছেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে হানাফী মাযহাবের কিতাবে হাদীস বিরোধী ফতোয়ার কিছু নমুনা নিম্ন তুলে ধরা হলোঃ-

হেদায়াঃ আবু হানিফার মৃত্যুর ৪০০ বছর পর লেখা হয়েছে। **মাসআলার নমুনা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি মাতা, ভগ্নি, নিজের কন্যা ও খালা ফুফুকে বিবাহ করে যৌন সঙ্গম করে তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতে, হদ জারি হবে না। (হেদায়া ১ম খঃ ৪৯৬ পৃঃ মোস্তফায়ী ছাপা।)

কাযী খাঁঃ আবু হানিফা (রঃ) এর মৃত্যুর ৪০০ বছর পর লেখা হয়েছে। **মাসআলার নমুনাঃ** স্ত্রী নিদ্রিত ও পাগলিনী অবস্থায় তার স্বামী (রোযা অবস্থায়) যৌন মিলন করলে কাফফারা লাগবেনা এবং রোযাও নষ্ট হবে না। (কাযী খাঁঃ ১ম খন্ড পৃঃ ১১০ মিসরী ছাপা)

শারহে বেকায়াঃ আবু হানিফা (রঃ) এর মৃত্যুর ৬০০ বছর পর লেখা হয়েছে। **মাসআলার নমুনাঃ** যদি কোন লোক মৃত স্ত্রীলোকের অথবা চতুষ্পদ জন্তুর স্ত্রী অঙ্গে বা অন্য কোন দ্বারে রোযা অবস্থায় বলৎকার করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। (শারহে বেকায়াঃ ১ম খন্ড পৃঃ ২৩৮ লক্ষ্ণৌএর ইউসুফী ছাপা)

দুররে মুখতার ঃ আবু হানিফা (রঃ) মৃত্যুর ৯০০ বছর পর লেখা হয়েছে। **মাসআলার নমুনাঃ** অঙ্গুলি ও স্ত্রী লোকের স্তন মলমুত্র দ্বারা নাপাক হয়ে গেলে

তিন বার জিব দিয়ে চেটে দিলে পাক হয়ে যাবে (দুর্রে মুখতার বাবুল আনজাসে পৃঃ ৩৬) হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন- ইমামের যোগ্য সেই ব্যক্তি হবে যিনি ভাল কুরআন পড়তে পারেন। যদি কুরআন পড়ায় সমান হয় তাহলে যিনি বেশী জ্ঞানী, যদি জ্ঞানও সমান হয়, তাহলে প্রথমে হিজরত কারী যে হবে, এতেও যদি সমান হয় তাহলে যিনি বয়সে বড় তিনিই ইমাম হবেন। (মুসলিম, মিশকাত- ১০০ ঃ) কিন্তু হানাফী ফিকার কিতাবে একধাপ বাড়িয়ে বলা হয়- পূর্বের শর্তাবলীতেও যদি সমান হয়, তাহলে দেখতে হবে কার বউ সুন্দরী। (দুররে মুখতার- ৪১৬ পৃঃ) তাতেও যদি সমান হয় দেখতে হবে কার মাথা বড় এবং পুরুষাঙ্গ ছোট (দুররে মুখতার-তাহাবী ১ম খন্ড মিসরী ছাপা।)

বেহেশতী জেওর ঃআবু হানিফা (রঃ) এর মৃত্যুর ১২০০ বছর পর লেখা হয়েছে। মাসআলার নমুনা ঃ- কেবল মাত্র নিকাহ হয়েছে এবং বরকন্যা এখনো বিদায় হয় নাই মজলিসেই আছে ইতি মধ্যে শোনা গেল কন্যার একটি সন্তান প্রসব হয়েছে, ঐ সন্তানকে ঐ স্বামীর সন্তান বলতে হবে। ঐ সন্তান হারামের নয়। (বেহেশতী জেওর উর্দু ৪র্থ খন্ড মাসলা নং ৯ পৃ ২৫৬) উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর ফতোয়া ওলীপুরী ও কাশেমীর নজরে পড়ে নাই কি ? উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী মুসলিমরা আমল করতে পারবে কি ? যা কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।সে জন্যেই মাওলানা রুমি তার মসনবীতে (সূফীদের নিটক মাওলানা রুমির যে মসনবী হলেও কুরআনের সমতুল্য) দুঃখ করে বলেছেন-

নওহা গার বাসদ মুকাল্লেদ দর হাদীস
জুজ তাময়ে নাবুদ মুরাদে আঁ খবিস ।

অর্থ ঃ মুকাল্লিদ ব্যক্তি যদিও হাদীস জেনে কান্নাকাটি করে তাক্বলীদের কারণে সে হাদীসের প্রতি আশা করা ব্যতিত আমল করতে পারে না। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) নিজেই একবার আবু ইউসুফকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে, তোমাদের ধ্বংস হোক তোমরা এইসব কিতাব গুলিতে আমার ওপর কত মিথ্যারোপ করছ, যা আমি বলিনি। ইমামের এই হুঁশিয়ারীর ফলস্বরুপ দেখা যায় যে,তার শিষ্যগণ তাদের ওস্তাদের সকল ফতোয়া অন্ধের মত সমর্থন করেননি।বরং ইমাম গাযযালীর (জন্ম ৪৫০ হিঃ) হিসাব মতে প্রধান দুই শিষ্য তাদের ওস্তাদের দুই তৃতীয়াংশ ফতোয়ার বিরোধীতা করেছেন। উল্যেখ্য যে শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ)তাক্বলীদ পন্থী আলেমদের কে ধিক্কার দিয়ে বলেনঃএদের সমস্ত এলেমের পুঁজি হল হেদায়া, শরহে বেকায়া প্রভৃতির মধ্যে। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে ? ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মৃত্যুর ৩০০ অথবা তদুর্ধ বছর

পরেকার লোক কি করে বলতে পারেন যে ইহা আবু হানিফা বলেছেন ? এদের কথা কি করে বিশ্বাস করা যাবে ? মুহাদ্দেসীনে কেরামের মত তারা একটি মাসআলারও সনদ (বর্ণনা) সূত্র উল্লেখ করতে পারেনি। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা তো একজন নয়। ইমাম আবু হানিফা নামে প্রায় একুশজন ব্যাক্তির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন- আবু হানিফা, নুমান বিন সাবেত কুফি, (জন্ম ৮০ হিঃ)। ২- আবু হানিফা, আহম্মাদ বিন দাউদ (মৃঃ ২৮৩ হিঃ) (যাদুল মা'আদ ২৫ পৃঃ)। ৩- আবু হানিফা, যিনি তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (তাকরীবুত তাহজীব পৃঃ১২৩)। ৪- আবু হানিফা, খালেদ বিন ইউসুফ, সাখামীর ছাত্র, (মিযানুল ই'তিদাল ৬-৩৭৩ পৃঃ)। ৫- আবু হানিফা, আসল নাম নুমান, পিতার নাম আবু আব্দুল্লাহ মাগফুর আইম্মাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন (ইবনু খালকান ২-১৯৯পৃ)। ৬- আবু হানিফা, খাওয়ারেযম সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন (তাহাবী)। ৭- আবু হানিফা, জুবাইর বিন মুত্বঈম এর মৃত্যুর সময় ছিলেন (মিযানুল ই'তিদাল ৬৪৪পৃঃ)। ৮- আবু হানিফা, সুলাইমান এর ছাত্র, তার বিখ্যাত ছাত্র আব্দুল করিম (প্রাগুক্ত ১৭১ পৃঃ)। ৯- আবু হানিফা, ইমাম শাফিয়ীর উস্তাদ সামা বিন ফজল এর পুত্র (মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী ১৪৩ পৃঃ)। ১০- আবু হানিফা, পিতার নাম বারা ছিল (কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনিয়্যা)। ১১- আবু হানিফা, আহম্মদ বিন মুসাদ্দিক নিশাপুরী (ইবনে নাজ্জার)। ১২- আবু হানিফা, মাতার নাম মাহান। (প্রাগুক্ত) ১৩ আবু হানিফা, আব্দুল করিম যায়লাঈ (প্রাগুক্ত)। ১৪- আবু হানিফা, সুলাইমান বিন হিব্বান (প্রাগুক্ত)। ১৫- ইমাম আবু হানিফা, উপাধী, সাগীর (রুহুল ঈমান)। ১৬- আবু হানিফা, জাফর বিন আহম্মদ (প্রাগুক্ত)। ১৭- আবু হানিফা, মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আলী। (প্রাগুক্ত)। ১৮- আবু হানিফা, আব্দুল্লাহ বিন ইব্রাহীম, দ্বিতীয় ইমাম আযম (প্রাগুক্ত)। ১৯- আবু হানিফা, বাকার বিন মোহাম্মদ (প্রাগুক্ত)। ২০- আবু হানিফা, শীয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ইমাম (মিলাল ওয়াননিহাল)। ২১- আবু হানিফা, নোমান বিন সাবিত, ইমাম আজম উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দামেস্কে জন্ম গ্রহণ করেন (তাকরীবুত তাহজীব ১৫৬পৃঃ --- বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন-৮৮পৃঃ, ইখতিলাফে উম্মত কা আলমিয়া পৃঃ ৫০০-৫০২)। ইমাম আবু হানিফার নামে ফিকাহর কিতাবে সনদ ব্যতিরেখে বলা হয়েছে , ইহা আবু হানিফা বলেছেন। ইহা আবু হানিফার মত। ইত্যাদি প্রশ্ন জাগে এটা কোন আবু হানিফা ? এই ২১ আবু হানিফার মধ্যে কোন আবু হানিফার মত? এর সমাধান ওলীপুরী ও কাশেমীরা দিতে পারবেন কি ? ওলীপুরী/ কাশেমী ও তাকী উসমানী

সহ মাযহাবী আলেমরা বলে থাকে যে ৪ ইমামের মাযহাব গুলোর মধ্যে যেকোন একটি মাযহাব অনুসরণ করা ফরজ। অথচ তাদের আক্বীদায় বিশ্বাসী রাজার বাগের পীর জিল্লুর রহমান তার প্রচারিত মাসিক আল-বায়্যিনাতে বলেনঃ ফরজ সাবেত করতে হলে কুরআন অথবা সহীহ হাদীস লাগবে। কিন্তু মাযহাব এর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কারণ কোন মাযহাবই রাসূল (সাঃ) এর যুগে এমনকি মহামতি ইমামগনের আমলেও প্রতিষ্ঠা হয়নি। রাসুলের ভাষায় নিন্দিত ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে মুসলমানদের মধ্যে এই সব মাযহাবী তাক্বলীদের উদ্ভব ঘটে। সে কাল থেকে যুগযুগ ধরে আজ পর্যন্ত ব্যক্তি তাক্বলীদ বা ব্যক্তি বিশেষের সাথে মাযহাবকে ফরজ বলে আসছে। হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোন বিদ্বানের তাক্বলীদ করাকে শাহ সাহেব 'ইহুদী স্বভাব' বলে ভীষণ ভাবে কটাক্ষ করে বলেন, যদি তুমি ইহুদীদের নমুনা দেখতে চাও তাহলে দুষ্ট আলেম দের দিকে তাকাও। যারা বিগত কোন ব্যক্তির তাকলীদে অভ্যস্ত। যারা কিতাব ও সুন্নতের দলিল সমুহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কোন একজন আলেমের কঠোরতা ও সু-ধারনা যুক্ত সমাধানকে কঠিন ভাবে আকড়ে ধরে। যারা মাসুম রাসুলের কালাম হতে বেপরোয়া হয়ে বিভিন্ন জাল হাদীস ও বাতিল ব্যাখ্যা সমুহকে অনুসরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে। তামাশা কেমন তারা যেন খোদ ইহুদী। (ইযালাহ পৃঃ ৮৪)। তিনি ব্যক্তির অন্ধ তাক্বলীদকে কুফরির সাথে তুলনা করেছেন। শাহ সাহেব বলেন (হে পাঠক বর্তমান সময়ে তুমি বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলেই জনসাধারণের মধ্যে দেখবে যে তারা বিগত কোন বিদ্বানের মাযহাবের অনুস্বরণ করে থাকে এবং তারা মনে করে যে, মাত্র একটি মাসআলাতেও যদি তার অনুস্বরণীয় বিদ্বানের তাক্বলীদ হতে সে বেরিয়ে যায়, তাহলে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে।ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী,যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁর অনুস্বরণ তার উপর ফরজ করা হয়েছে অথচ চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। (মিয়ারুল হক পৃঃ ৫৩ সৈয়দ নবীর হোসাইন)। তিনি বলেন আমি আল্লাহর জন্য অল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে এটা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী হবে যদি উম্মতের কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ এই আকীদা পোষণ করে যে অল্লাহ পাক আমার উপরঐ ব্যক্তির অনুকরণ অপরিহার্য করেছেন এবং ঐ ব্যক্তি আমার উপর যা ওয়াযিব করেন তাই-ই ওয়াযিব। (শাহ ইসমাইল শহীদ তানভীরুল আইনাইন ফী ইসবাতি রাফউল ইয়াদাইন পৃঃ ৩৭) শাহ ইসমাইল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ)নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অন্ধ ভাবে

অনুস্বরণ করাকে শিরকের সাথে তুলনা করেছেন।তিনি বলেন, অমি বুঝতে পারিনা অনুস্বরণীয় ইমামের কথার বরখেলাপ রাসুলের স্পষ্ট হাদীস সমুহের দিকে ফিরে যাওয়ার যাবতীয় ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্বেও কিভাবে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদকে ফরজ গণ্য হতে পারে ? সহীহ হাদীস পাওয়া সত্বেও যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তিটি তার ইমামের কথা পরিত্যাগ না করে তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শিরকের দোষ মিশ্রিত আছে। তাই দেখা যায়-মাওলানা রুমি মাযহাবি অন্ধ তাক্বলীদ থেকে তওবা ও অনুশোচনা করে ফিরে এসেছেন। পরবর্তীতে অন্ধ তাক্বলীদ তথা মাযহাবীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। মাযহাবী সূফীগন মাওলানা রুমির মসনভীর সর্ম্পকে ঘোষনা করেন ঃ-

মসনভী এ মৌলভী এ মানভী
হস্তে কুরআ দর জবানে পাহলভী

মানে- মাওলানার মসনভী কিতাব খানা যেন ফার্সী ভাষায় কুরআন শরীফ। সেই মসনভীতেই মাওলানা রুমি বলেনঃ-

আরি ইয়াস্ত ওমানে সাস্ত ওয়া কামে মাস্ত
ইলমে তাক্বলীদি ও বালে জানে মাস্ত

অর্থঃ ইতি পূর্বে আমার ইলম ছিল তাক্বলীদ ভিত্তিক শেষ জীবনে আমি লজ্জিত ঘরে বসে আছি।এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত। তিনি তাক্বলীদের উপর অভিশাপ করে বলেন ঃ

মরমুরা তাক্বলীদে সানে বরবাদে দাদ
কে দুসদ লানতে বরয়া তাক্বলীদে দাদ।

অর্থঃ আমাকে তাক্বলীদ ধ্বংস করে ছিল,যে তাক্বলীদ আমাকে ধ্বংস করেছে তার উপর দুইশত বার লানত বর্ষিত হোক।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমানিত হল যে ইসলামে কোন ব্যক্তি বিশেষের তরীক বা মাযহাব ফরজ গন্য করেন নাই। ফরজ করেছেন কুরআন, সুন্নাহকে। যারা এই দুটি বিষয়কে সামনে রেখে ফায়সালা দিবেন সে বিষয় মানাই ফরজ।ইবনে হাযম বলেন, অজ্ঞ ব্যক্তি একজন হেদায়াত প্রাপ্ত আলেমের কথার অনুস্বরণ করবে এই ধারনায় যে, তিনি সঠিক কথাই বলবেন এবং রাসুলের সুন্নাতের অনুস্বরণের ফতোয়া দিবেন। কিন্তু পরে যদি তিনি তার ধারণার খেলাফ কিছু পান, তাহলে কোন রূপ ঝগড়া বা যিদ না করে সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের দিকে ফিরে যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা য়ায়- একদিন মুয়াবীয়া (রাঃ) মদীনায় এসে মসজিদের মেম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন- আমি মনে করি সিরিয়ার দুই

মুদ (অর্ধ ছা) গম (মূল্যের দিক দিয়ে) মদীনার এক ছা খেজুরের সমান। সাথে সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মুয়াবীয়া (রাঃ) এর উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন- আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবো ততদিন রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিতে এক ছা ফিতরা আমি আদায় করবো। (মুসলিম) পাঠক দেখুন এখানে সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান মুয়াবীয়া (রাঃ) এর ইজতিহাদকে রাসূল (সাঃ) এর হাদীসের বিপরীতে অগ্রাহ্য করেছেন। তাই মানুষ তার চলার পথে তার ধর্মীয় বৈষয়িক জীবনে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, জানাজা, কিংবা চাকুরি, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্টনীতি, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসায়, দান-খয়রাত, বিচার, আদালত, তথা জীবনের যে স্তরেই সে থাকুক না কেন ? তাকে প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে তৎপর ছহীহ হাদীস থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে। যদি সেখানে স্পষ্টভাবে না পাওয়া যায় তাহলে খুলাফায়ে রাশিদীনের সিদ্ধান্ত তালাশ করতে হবে, সেখানেও না পাওয়া গেলে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বর্ণিত মুলনীতির আলোকে ইজতিহাদি বা শরীয়তের গবেষনায় মনোনিবেশন করে সমাধান প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যেতে হবে। এখানে গিয়ে বিভিন্ন বিদ্বানের বিভিন্ন ইজতেহাদি সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তখন সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীসে বর্ণিত মৌলিক বিধানের নিকটবর্তী বলে প্রতিয়মান হবে সেটি গ্রহন করতে হবে, উপরোক্ত বিষয়ের উপর যারা কাজ করবে, সাধারন মানুষ তাদেরকে অনুস্বরণ করবে। অর্থাৎ মুক্ত তাক্বলীদ করবে। এ ব্যপারে ব্যক্তি তাক্বলীদ অর্থাৎ এককভাবে কোন একজন মুজতাহিদ বিদ্বানের সিদ্ধান্তর অন্ধ অনুস্বরন করা যাবে না বরং সর্বদা ছহীহ হাদীসের তালাশে থাকতে হবে। যখনই তা পাওয়া যাবে তখনই পূর্বের আমল বাতিল হবে এবং ছহীহ হাদীসের উপর আমল করতে হবে। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের মহামতি ইমামগনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হল :

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর অভিমত : ইমাম আবু হানিফা (রঃ) উপরোক্ত কথাকেই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন : যে কোন সমস্যার সমাধানে আমি সর্ব প্রথম আল্লাহর কালাম আল কুরআন এর আশ্রয় নিয়ে থাকি। তাতে সমাধান না পেলে, আমি রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতে অনুসন্ধান করি। তাতে সমাধান না পাওয়া গেলে, সাহাবাগনের মধ্যে হতে যাঁর উক্তি আমার পছন্দ হয় আমি তা বেছে নেই। সাথে সাথে তিনি উদার মন নিয়ে তাঁর অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন : কোন সমস্যা সমন্ধে সহীহ হাদীসে যে সমাধান পাওয়া যাবে, তাকেই তোমরা আমার মাযহাব বলে জানবে। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে হুসিয়ার করে

বলেন- আমার সিদ্ধান্ত রাসূল (সাঃ) নির্দেশের বিপরীত হলে উহা ফেলে দিও। (মিফতাহুল জান্নাহ-৪৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালেক (রঃ) এর অভিমত : ইমাম মালেক (রঃ) বলেন আমি একজন মানুষ মাত্র। কোন বিষয়ে আমার অভিমত যেমন সঠিক হতে পারে তেমনি ভ্রান্তি পূর্ন হওয়াও সম্ভবপর। অতএব তোমরা আমার উক্তি কুরআন ও সুন্নার দ্বারা যাচাই করে দেখবে। (ইবনে আবদিল বার আলজানি ২/৩২)

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন আমার কোন উক্তি যদি রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশের প্রতিকুল দেখতে পাও তাহলে রাসূল (সাঃ) হাদীস অনুস্বরণীয় হবে। তোমরা আমার উক্তির তাক্বলীদ করবে না। (ইকদুল জীদ পৃ ঃ ৫৭)। তিনি বলেন- রাসূল (সাঃ) ব্যতীত কারও কথা দলীল নয়। তাদের সংখ্যা অধিক হলেও নয়। কিয়াস অথবা অন্য কোন বিষয়েও নয়। এবার তিনি দ্যর্থহীন ভাবে বলেন : সাহাবাগনও মানুষ ছিলেন আর আমরাও মানুষই বটে। সুতরাং আমাদের মতামতের পক্ষেও ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভপর। অতএব সহীহ হাদীস প্রাপ্ত হবার পর সাহাবাগনের ইজতিহাদের অনুস্বরণ করা আবশ্যক নয়। অধিকন্তু উহা বর্জন করা এবং হাদীস অবলম্বন করে চলাই কর্তব্য। (ফিরকা বন্দী বনাম অনুস্বরণীয় ইমামগণের নীতি ১ম খঃ পৃঃ ১৫)

ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এর অভিমত : ইমাম হাম্বল বলেন তোমরা আমার তাক্বলীদ করোনা, মালেক, নখঈ বা আওযায়ী বা অন্য কারো তাক্বলীদ করো না বরং সমাধান গ্রহণ কর কিতাব ও সুন্নাহ হতে। (ইলমুল মুওয়াককেঈন ২/৩০২ আল হাদীস হুজ্জাতুল পৃঃ ৭০।)

উল্লেখিত মহামতি ইমামগণের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার বিধান কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলছে। তাঁদের কথা বিলকূল সঠিক। কারণ রাসূল (সাঃ) বলছেন। আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে গেলাম (কুরআন ও হাদীস) তা যদি তোমরা আকরিয়ে ধর তবে হেদায়াত পাবে। (মালেক, হাকেম, সহীহুল, জামিউস,সাগীর, হাদীস নং ২৯৩৪) অতএব প্রমাণিত হলো প্রচলিত মাযহাব মানা ফরজ নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহ মানা ফরজ। ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেবের দাবি ভিত্তিহীন ও জাকির নায়েকের দাবি সঠিক।

৪ নং অভিযোগ ঃ ভারতের দেওবন্দী ভক্ত সাইয়্যিদ খালিক সাজিদ নামক ব্যাক্তি **"হাকীক্বতে জাকির নায়েক"** গ্রন্থ লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থের অবলম্বনে ওলীপুরী ও কাশেমী ভক্ত মাওলানা অলীউর রহমানের লিখা প্রবন্ধে অলীউর রহমান বলেন-

জাকির নায়েক এক বক্তব্যে বলেছিলেন- মুসলমানগণ পরিচয় দেয়, আমি হানাফী, আমি শাফয়ী, আমি হাম্বলী, আমি মালিকী। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কি হানাফী, শাফয়ী, মালিকী, হাম্বলী ছিলেন? না শুধু মাত্র মুসলমান ছিলেন ? উক্ত কথার জবাব দিতে গিয়ে অলীউর রহমান বলেন- পবিত্র কুরআন হাদীসের জ্ঞানে অজ্ঞ হওয়ার কারণে জাকির নায়েকের ঐ হাদীসটি জানা নেই। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। আর বাহাত্তর দল জাহান্নামী ও একদল জান্নাতি হবে। কিন্তু সেই সব দলের উৎপত্তি রাসূলের যুগে হয় নাই। তার পরের যুগে হয়েছে বিধায় ভ্রান্ত দলের বিপরীতে বিশুদ্ধ দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা সুন্নি। তাই মুসলিম পরিচয় দেওয়া বোকামী ইত্যাদি। অলীউর রহমান নিজেই হাদীসে উল্লেখ করেছেন একটি দল হবে জান্নাতি, তাহলে তারা চার মাযহাবে বা দলে বিভক্ত হয়ে জাহান্নামী হচ্ছে কেন ? দলতো একটি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। আল্লাহ পাক বলেন- মানুষেরা তো একই জাতি ভুক্ত ছিল অতঃপর তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়। (ইউনুষ-১৯) এই সব ভাগাভাগি দলা দলির বিরুদ্ধে নবী (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল- নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে খন্ড খন্ড করে ও দলা দলি করে তাদের সাথে তোমার কোন সংস্রব নেই। (আনআম-১৫৯) রাসূল (সাঃ) বলেন- যারা আমার দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দল গঠন করে তারা ইসলাম হতে বের হয়ে যায় (কিতাবুস সুন্নাহ, ২য় খন্ড-৫০২পৃঃ) রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন যারা আমার প্রতিষ্ঠিত দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দল করবে তারা কাফের হয়ে মারা যাবে। (কিতাবুস সুন্নাহ, ইবনে আবি হাশেম হয় খন্ড-৪৩৬পৃঃ) পাঠক এবার বলুন হাদীসের জ্ঞানে কে অজ্ঞ? অলীউর রহমান! ভ্রান্ত দল সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি মুললিম পরিচয় দিতে রাজি নয়। হানাফী পরিচয় দিতে রাজি। তার মানে মুসলমানিত্ত না থাকলে না থাক। তবুও হানাফীয়াত ঠিক থাক। অথচ আল্লাহ বলেন- "আমার মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম" (ইমরান-১৯) "তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত বরণ কর না।" (ইমরান-১০২) অলীউর রহমান সাহেব মুসলমান না হয়ে হানাফী হয়ে মরতে চান। মরার পরে কবরে গেলে প্রশ্ন করা হবে- তোমার দ্বীন কি? তখন অলীউর রহমান কি উত্তর দিবেন? তিনি কি এই বলে উত্তর দিবেন যে, আমি হানাফী বা সুন্নি।আর এগুলো উত্তর দেওয়া যাবে তো? অথচ আল্লাহ পাক বলেন- প্রথম হতে আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। (হজ্ব-৭৮) আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ তোমার পরিচয় দাও আমরা মুসলমান (ইমরান-৫১) আর অলীউর রহমান আল্লাহর ভূল ধরে বলেন মুসলিম

পরিচয় দেওয়া বোকামী কেননা তখন অনেক ভ্রান্ত দল তৈরী হয়েছিল। অলীউর রহমানকে বলছি ঐ ভ্রান্ত দল গুলি যে তৈরী হবে এটা কি আল্লাহ পাক জানতেন না? মুসলমান পরিচয় দেয়ার কথা বলে আল্লাহ বোকামী করেছেন তাইনা? আবার নবীদের ব্যপারে কুরআনে বলা হয়েছে আমিতো মুসলিমদের অর্ন্তভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি। (ইউনুস-৭২) অলীউর রহমানকে দৃষ্টি আর্কষণ করছি- নবীরা মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিয়ে কি বোকামী করেছেন? এ হলো অলীউর রহমানের আক্বীদা। যারা আল্লাহর ভূল ধরতে পারে, নবীদের ভুল ধরতে পারে তারা জাকির নায়েকের ভূল ধরতে পারবে না কেন? রাসুলের ভাষায় নিন্দিত ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে মুসলমানদের মধ্যে এই সব মাযহাবী তাক্বলীদের উদ্ভব ঘটে। শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর ইযালাতুল খফা গ্রন্থে বলেন বনু উমাইয়াদের শাসনের অবসান কাল (১৫০ হিঃ) পর্যন্ত কোন মুসলিম নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী বলতেন না। হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী ক্বারী বলেন এটা জানার কথা যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাউকে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী হওয়ার জন্য বাধ্য করেননি। বরং বাধ্য করেছেন সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার জন্য। অলীউর রহমানের মতে কি হানাফী আলেম মোল্লা আলী ক্বারী অজ্ঞ? অলীউর রহমান বলতে পারেন কি? ১৫০ হিজরী পূর্বে মুসলিমরা ঐ ভ্রান্ত দলগুলো থাকার পরও তাঁরা কি নামে পরিচয় দিয়েছেন? অলীউর রহমানের জ্ঞাতার্থে বলছি ৭২ ফেরকা বা ভ্রান্ত দলের ভয়ে আপনি মুসলিম পরিচয় দিতে রাজি না। হানাফী পরিচয় দিতে রাজি। তাহলে শুনুন আপনাদের কাদরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও তার হানাফী মাযহাবকে ৭২ ফেরকার মধ্যে গণ্য করে ভ্রান্ত দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (গুনিয়াতুত্তালেবীন পৃঃ ২৭৬ মূল আবদুল কাদের জিলানী অনুবাদ বদিউল আলম)

আপনাদের বড় পীর এর ফতোয়া অনুযায়ী আপনারা ভ্রান্ত। এ কথা আপনারা মানবেন কি? তাছাড়া অলীউর রহমান বলেছেন- ভ্রান্ত দল শিয়া, মর্জিয়া, সবাই মুসলিম পরিচয় দেয় তাই মুসলমান পরিচয় না দিয়ে হানাফী পরিচয় দিতে হবে। অলীউর রহমানের সূত্রানুপাতে ভ্রান্ত পীর দেওয়ান বাগী, আটরশ্মি, মাইজভান্ডারী, মাযার পুজারী, সবাইতো হানাফী পরিচয় দেয়। এখন অলীউর রহমান কি নামে পরিচয় দিবেন? আগে মুসলিম বাদ দিয়ে হানাফী হয়েছিলেন এখন হানাফী বাদ দিয়ে কি হবেন বলবেন কি?

৫ নং অভিযোগ ঃ জাকির নায়েক ভ্রান্ত সালাফীবাদের দাওয়াত দেয়। অভিযোগ খন্ডনের মনসে সালাফী আক্বীদা ও ওলীপুরী এবং কাশেমীর আক্বীদার পার্থক্য আমারা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব। পাঠক এটা সকলেরই জানা। কুরআন সুন্নাহ্ বর্ণিত আক্বীদা হলো সালাফী আক্বীদা যে আক্বীদার দাওয়াত রাসূল (সাঃ) দিয়ে গেছেন এবং তার সাহাবাগণ। ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে পবিত্র মক্কা মদীনায়। যে পবিত্র ভূমিতে রাসূল (সাঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে যেখানে কোন ফিৎনা প্রবেশ করবে না এমনকি দাজ্জালও না। যে শহর আল্লাহ নিজেই রক্ষা করবেন। যেখানে মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে। যেখানে পবিত্র কাবাঘর দন্ডায়মান সেই পবিত্র ভূমি গুলি আজ সালাফী আক্বীদা আমল দ্বারা সম্মৃদ্ধ। অসংখ্যা সাহাবীদের বিচরণ ভূমি অন্তিম নিদ্রাস্থল সৌদি আরব, কুয়েত, ইয়ামেন, বাহ-রাইন, সিরিয়া সহ গোটা আরব ভূমি আজ সালাফীদের দ্বারা পরিচালিত। মক্কা মদীনার ইমামগণের আক্বীদা সালাফী আক্বীদা ওলীপুরী ও কাশেমীকে বলি , কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত আক্বীদা কি ভ্রান্ত ? রাসূল সাঃ যে আক্বীদার দাওয়াত দিয়েছেন সে আক্বীদা কি ভ্রান্ত ? সাহাবাদের আক্বীদা কি ভ্রান্ত ? মক্কা মদীনার ইমামগণের আক্বীদা কি ভ্রান্ত ? তাহলে অভ্রান্ত কে ? অথচ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ইসলাম আসছে গরীব অবস্থায় ফিরেও যাবে গরীব অবস্থায়। সাপ যেমন কুঞ্চিত হয়ে গর্তে ডুকে যায় ইসলাম ঠিক সেই ভাবে মদীনায় প্রত্যাবর্তণ করবে। (তিরমিযী) তাই বলা চলে, মদীনার ইসলামই ঠিক থাকবে এবং আছে। আর সেই মদীনার মানুষের আক্বীদা হলো সালাফী আক্বীদা। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর আক্বীদা হলো এই সালাফী আক্বীদা। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর আক্বীদাই হলো জাকির নায়েকের আক্বীদা অর্থাৎ সালাফী আক্বীদা। ওলীপুরী ও কাশেমীকে বলছি হানাফী মাযহাবের ইমাম তাহাবীর লেখা আক্বীদায়ে তাহাবীতে পীর মুরীদীর আক্বীদা দেখাতে পারবেন কি ? যদি দেখাতে না পারেন তবে কেন ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর সালাফী আক্বীদা ত্যাগ করে ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে হানাফী দাবী করেন কেন ? সাধারণ জনগণকে আর কত ধোঁকা দিবেন।

ওলীপুরী / কাশেমী ও জাকির নায়েকের মধ্যে আক্বীদার পার্থক্য

ওলীপুরী ও কাশেমী ও জাকির নায়েকের আক্বীদা বিশ্বাস একে অপরের বিপরীত। ওলীপুরী ও কাশেমীর আক্বীদা কুরআন সুন্নাহ বহির্ভুত ভ্রান্ত সূফী মতবাদ কেন্দ্রিক, পক্ষান্তরে জাকির নায়েকের আক্বীদা কুরআন সুন্নাহ

কেন্দ্রিক। জাকির নায়েক বিশ্বাস করেন আল্লাহ সত্ত্বাগত ভাবে আকাশে থাকেন। (ত্বহা-০৫) আল্লাহর গুণাবলী সর্বত্র বিরাজমান তথা তাঁর গুণ সর্বব্যাপি। (ত্বহা-৪৬) কারণ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তথা আল্লাকে সর্ব জায়গায় কল্পনা করা বহু আল্লাহবাদের জন্ম দেয়। যা সম্পুর্ণ শিরক। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমীর আক্বীদা হলো আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। জাকির নায়েক বিশ্বাস করেন আল্লাহর আকার আছে (যুমার-৬৭) আল্লাহর হাত আছে (ফাতহ-১০) আল্লাহর চোখ আছে (হুদ-৩৭) আল্লাহর মুখ আছে (বাকারা-২৭২) আল্লাহর পা আছে (কালাম- ৪২) আল্লাহর আঙ্গুল আছে। (বুখারী, মিশকাত আরবী-৪৮২) আল্লাহর হাসি আছে (মিশকাত আরবী - ৩৩০) যে ভাবে কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার বেশী নয়। (আল্লাহর আকার জনিত আয়াত ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করা যাবে না এবং ঐ আকার নিয়ে কোন রকম মনগড়া কল্পনা করা যাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী- আল্লাহ শুনেন এবং সব কিছু জানেন (ইমরান-২২১) এখানে আল্লাহর শ্রবণের কথা বলা হয়েছে, কানের কথ বলা হয় নাই। তাই কল্পনা করে আল্লাহর কান আছে একথা বলা যাবে না। এবং এ আয়াতের কোন রুপ বিকৃতিও করা যাবে না।) এ আকার কোন সৃষ্টির মত নয়। কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না। (শু'রা-১১) তিনি অজানা আকার। তাকে জ্ঞান দ্বারা আমরা আয়ত্ব করতে পারব না। (ত্বহা-১১০) আল্লাহর আকার আল্লাহর মত, তাঁর মত কিছুই নেই। আল্লাহ নিরাকার নন। কেননা যার আকার নেই তার অস্তিত্বই নেই। এ বিশ্বাস নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী আল্লাহ নিরাকারে বিশ্বাসী। জাকির নায়েক বিশ্বাস করে আল্লাহই একমাত্র গায়েব (অদৃশ্য) এর মালিক। (নমল-৬৫) গায়েবের মালিক নবী রাসূল ও পীর ওলীগণ নন। বিশেষ ক্ষেত্রে গায়েবের কিয়দাংশ খবর নবীদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহ নিজে। (হুদ-৪৯) নবীগণও গায়েব জানতেন না। (আরাফ-১৮৮) নবী (সাঃ) এর তিরোধানের পর গায়েবের দরজা চিরতরে বন্ধ। অলীদের জন্য তো প্রশ্নই আসেনা। তাই নবী ও ওলীরা গায়েবের খবর বা আগাম খবর জানে এ বিশ্বাস করা শিরক। কিন্তু অলীরা গায়েব জানে বলে বিশ্বাসী সূফী ও পীরদেরকে ওলীপুরী ও কাশেমী সমর্থন করে চলে। তার প্রমাণ পরে দেওয়া হবে। জাকির নায়েক হাজির নাজির বলতে আল্লাহকে বুঝেন। নবী ও পীরদেরকে বুঝেন না। কেননা আল্লাহ গুণাবলীর দিক দিয়ে সর্বত্র হাজির নাজির (হাদীদ-০৪) কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী যারা নবী ও

অলীদেরকে হাজির নাজির বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে চোখ বন্ধ করে সমর্থন করে এবং তাদের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেয়। জাকির নায়েক জিন্দা নবী (হায়াতুন্নাবী) জিন্দা পীরে বিশ্বাসী নয়। কারণ আল্লাহ হলেন চিরঞ্জীব চিরসত্ত্বা (বাকারা-১৫৫) আল্লার সত্তার কোন ধ্বংস নেই ক্ষয় নেই লয় নেই। নবীরা মানুষ ছিলেন (কাহাফ-১১০) আর মানুষ মরণশীল। নবীরাও মারা গেছেন (ইমরান-১৪৪) নবীদের লাশ কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকবে। (আবু দাউদ-সলাত অধ্যায় হা / ১০৪৭) তাই জিন্দা নবী বলা হায়াতুন্নাবী বলা ভ্রান্তি ছাড়া আর কি হতে পারে ? কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী এ আক্বীদায় বিশ্বাসী। জাকির নায়েক বিশ্বাস করে মানুষ মাটির তৈরী (রুম-২০) রাসূল (সাঃ) মানুষ ছিলেন (কাহাফ-১১০) অহী আসার ভিত্তিতে তিনি নবুওয়াতীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ মর্যাদার কারণে তিনি সকল মানুষের সেরা মানুষ। রাসূল (সাঃ) নুরের তৈরী নয়। রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরী হলে তাঁর মর্যদা কমে যায়। কেননা মাটির তৈরী মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করছেন (বনী ইসরাঈল-৭০)। নূরের তৈরী মানুষকে সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করা হয় নাই। তাই তিনি মাটির তৈরী মানুষ নূরের তৈরী নয়। আবার মাটির তৈরী মানুষকে আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর করে বানিয়েছেন। (সূরা ত্বীন) নূরের তৈরী মানুষকে সুন্দর করে বানানোর ঘোষণা আল্লাহ দেন নাই। মাটির তৈরী মানুষকে আল্লাহ তারঁ ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন (যারিয়াত-৫৬)। তাই রাসূল (সাঃ) নিজে ইবাদত করতেন। তাই নবীকে মাটির সৃষ্টি না বলে উপায় নেই। কিন্তু নূরে মুহাম্মাদী আক্বীদায় বিশ্বাসী সূফীদেরকে ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব নিরবে সমর্থন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরী সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবই জাল ও মিথ্যা। জাকির নায়েক প্রচলিত পীর মুরীদীতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব প্রচলিত পীর মুরীদে বিশ্বাসী। জাকির নায়েক সূফীদের দেয়া প্রচলিত চার তরীকায় বিশ্বাসী নয়। কারণ সূফীদের চার তরীকা আধ্যাত্বিকতার নামে হিজরী দশম শতাব্দীতে চালু হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ-)। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী চার তরীকায় বিশ্বাসী। জাকির নায়েক প্রচলিত চার মাযহাবে বিশ্বাসী নয়। কারণ চার মাযহাব রাসূল (সাঃ) এর নিন্দিত যুগ হিজরী চতুর্থ শতাব্দিতে এর প্রচলন ঘটে। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী প্রচলিত চার মাযহাবের অন্ধ অনুসারী। জাকির নায়েক প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের চিল্লাকাশীতে বিশ্বাসী নয়। কারণ বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সন্যাসীদের থেকে এ চিল্লার

আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী তাবলীগের প্রচলিত চিল্লা প্রথার ধারক-বাহক। জাকির নায়েক বিশ্বাস করে আল্লাহর দেয়া দ্বীন ও শরীয়ত পরিপূর্ন (মায়িদা-০৩) কিন্তু ওলীপুরী / কাশেমী দ্বীন ও শরীয়ত পরিপূর্ণ একথায় বিশ্বাসী নয়। জাকির নায়েক তাবিজ কবজে বিশ্বাসী নয়। কারণ তাবিজ ব্যবহার শিরক। (আহমদ-তিবরানী) কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী তাবিজ-কবজে বিশ্বাসী। জাকির নায়েক প্রচলিত কারামতি, জাদুটোনা, মাজারপুঁজা, মিলাদ, জন্মবার্ষীকি, মৃত্যু ব্যাক্তির জন্য খতমে কুরআন, খাজেগান ও জালালীতে বিশ্বাসী নয়। কেননা এগুলো সবই সুন্নাহ বিরোধী বিদআত। পক্ষান্তরে ওলীপুরী ও কাশেমী উপরোক্ত বিষয়গুলি ও দেওবন্দী আলেম শিরমনিদের ধারক বাহক হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাদের আক্বীদাকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। ওলীপুরী কাশেমী ও দেওবন্দীদের আক্বীদা হলো- নবী ও অলীগণ জীবিত। তাদের আত্মা ভক্তগণকে সাহায্য করে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করে, তাদের আত্মা স্বশরীরে ভক্তগণের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাদের জন্য সময় কমে আসে, রাস্তার দুরত্ব সংকুচিত হয়। তারা গায়েব বা অদৃশ্যের খবরা খবর রাখে, তাদের অলীরা কখনো স্রষ্টা, কখনো নবীদের (আঃ) গুণে গুণান্বিত হতে পারে এবং তা দাবিও করতে পারে। তাদের কাছে আল্লাহর বাণী অবর্তীণ হয়, কেননা তাদের ধারণা মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী নন। এর পরও নবী হবে, নবীর গুণ শুধু নবীর জন্য খাছ নয় তাদের অলীদের জন্যও নবীর গুণ ব্যবহার করা যায়। কবরের ধ্যানে, পীরের ধ্যানে, (ফানাফিস্‌শায়েখ) পীরের মধ্যে বিলীন হওয়াতে বিশ্বাসী তারা ইসলাম বর্হিভূত ভ্রান্ত সূফীবাদে বিশ্বাসী। তারা (ফানাফিল্লাহ) আল্লাহতে বিলিন হয়ে বাকাবিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বায় অবস্থানে বিশ্বাসী। যদিও কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ সমস্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস একেবারেই তাওহীদ বিরোধি শিরক।

ভ্রান্ত কে? ওলীপুরী / কাশেমী না জাকির নায়েক?

ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব বলেছেন জাকির নায়েক - ভ্রান্ত সালাফীবাদ ও মওদূদীবাদের দাওয়াত দেয়। আমরা এখানে প্রমাণ করবো কে ভ্রান্ত মতবাদের দাওয়াত দেয়। পাঠক জানা আবশ্যক যে, বাংলাদেশে হানাফী মাযহাব পন্থি দেওবন্দী সূফীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এক দেওবন্দী দুই ব্রেলভী। দেওবন্দী সুফীদের গুরু হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী এবং

ব্রেলভী সূফীদের গুরু আহমদ রেজা খান। এদের আক্বীদা বিশ্বাস প্রায় একই। পার্থক্য শুধু এতটুকু ব্রেলভী সূফীরা তাদের আক্বীদাহ বিশ্বাসের প্রচারনা প্রকাশ্য ভাবে করে থাকে। আর দেওবন্দী সূফীরা তাদের আক্বীদাহ ও বিশ্বাস এর প্রচারণা অতিসুক্ষ্মভাবে আধ্যাত্মিক এর নামে বা ফযিলতের নামে বয়ান করে এবং তাদের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ করে থাকে। যাতে সাধারণ লোকজন বুঝতে না পারে। আক্বীদাহ বিশ্বাসের দিক দিয়ে উক্ত দুইটি দল একে অপরকে ভ্রান্ত বলে জানে। দেওবন্দীরা রেজাখানকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, তারা সরাসরি নবী ও অলীদেরকে আল্লাহ পাকের সিফাত বা গুণ এর অধিকারী মনে করে। তারা নবী ও অলীদেরকে আলিমুল গায়েব হাজির-নাজির রক্ষাকর্তা ও ত্রাণকর্তা মনে করে। তারা প্রকাশ্য ভাবে মাজার পুঁজা ও প্রেম ভক্তির অনুরাগ হয়ে গান বাজনা করে। এদের অনুসারীদের মধ্যে বাংলাদেশের বিশ্ব জাকির মঞ্জিল, তথা আট রশি, চট্রগ্রামের মাইজভান্ডারী, ঢাকার দেওয়ান বাগী, সিলেটের ফুলতলী, মানিক গঞ্জের পীর ও অন্যান্য মাজার পুঁজারীগণ। আবার ব্রেলভীদের গুরু রেজাখান, দেওবন্দীদেরকে এ বলে প্রত্যাখ্যাণ করে যে, দেও + বান্দ = দেওবান্দ। দেও অর্থ দেও দানব বা জ্বিন শয়তান আর বান্দ অর্থ বান্দা অর্থাৎ দেওবন্দ মানে শয়তানের বান্দা কেননা দেওবন্দীদের লেখা কিতাবে নবী ও অলীদেরকে আলিমুল গায়েব, নবী ও অলীগণ হাজির-নাজির তারা বিপদের সময় মানুষকে রুহানী জগত থেকে সরাসরি উঠে উদ্ধার করার ঘটনা ভরপুর এবং তাদের অনেক ওয়াজ মাহফিলে এমন অনেক ঘটনা বলতে দেখা যায়- দেওবন্দীদের উপরোক্ত আক্বীদাহ যখন রেজাখানের দল প্রকাশ্যে প্রচার করে, তখন দেওবন্দীরা তাদের বিরুদ্ধে ফাতোয়া দিতে থাকে কিন্তু দেওবন্দীরা যখন তাদের কিতাবে ওই গুলি শিরকি আক্বীদা লিপিবদ্ধ এবং ওয়াজ এর ভঙ্গিমায় অথবা গোপনে প্রচার করে তখন রেজাখান এর দল দেওবন্দীদেরকে শয়তানের বান্দা বলে আখ্যায়িত করে। যেমন-ব্রেলভী ও দেওবন্দী উভয় দলই বিশ্বাস করে যে, রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরী। এ আক্বীদা দেওবন্দিরা প্রকাশ্যে প্রচার করলে কোন দোষ নাই। কিন্তু ব্রেলভীরা করলে মারাত্মক ভূল হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, নেত্রকোনার ব্রেলভী গ্রুপ আলী হোসেন রেজভী রাসূল (সাঃ) কে নূরের তৈরী বলার কারণে দেওবন্দী গ্রুপ নূরুল ইসলাম ওলীপুরী তার বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের দেওবন্দি গ্রুপের মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওঃ মহিউদ্দিন খান ও শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল

হক সাহেব রাসূল (সাঃ) কে নূরের তৈরী বলে প্রকাশ্য প্রচার চালায় তখন ওলীপুরী সাহেব একেবারেই চুপ। উল্লেখ যে, দেওবন্দী ও ব্রেলভী দুইটি দলই ইবনে আরাবীর ভ্রান্ত মতবাদ **"ওয়াহদাতে ওযুদ"** মতবাদে বিশ্বাসী। আমরা এখানে জাকির নায়েকেরে বিরোধিতার কারণ হিসাবে ওলীপুরী / কাশেমী ও দেওবন্দীদের আক্বীদা এক এক করে তুলে ধরবো। যাতে করে পাঠক বুঝতে পারেন ওলীপুরী ও কাশেমী, জাকির নায়েকের বিরোধীতা করে কেন?

দেওবান্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাশেম নানুতুবী

মাওঃ কাশেম নানুতুবী (জন্ম ১২৪ হিঃ) খতমে নবুওয়াত গবেষণায় বলেন- হুজুর (সাঃ) এর যুগ পরবর্তী নবীদের যুগের পরে এবং তিনি সবার মধ্যে শেষ নবী এটা সাধারণ লোকদের ধারণা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সময়ের আগে ও পরে হওয়ার ব্যাপারে কোন মাহাত্ম স্বীকার করেন না। তাহলে প্রসংশার ক্ষেত্রে আল্লাহর খাতমুন নাবিয়্যীন বলাটা কি করে সঠিক হতে পারে ? (তাহযীরুল নাস পৃঃ ৩) এ কথা সকল মুসলমানই জানে যে, আল্লাহ পাক রাসূল (সাঃ) কে খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষ নবী উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন। (সূরা-আহযাব) কিন্তু দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাশেম নানুতুবী রাসূল(সাঃ) কে শেষ নবী বলে স্বীকার করেন না। রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ পাক খাতামুন নাবিয়্যীন উপাধিতে ভূষিত করাকে মাওলানাঃ কাশেম নানুতুবী আল্লাহ পাকের ভূল ধরিয়ে দিয়ে বলেন যে, প্রসংশার ক্ষেত্রে আল্লাহর খাতামুন নাবিয়্যীন বলাটা কি করে সঠিক হতে পারে ? (নাউযুবিল্লাহ) নানুতবীর উক্ত ফতোয়ার উপর বিশ্বাস রাখলে মুসলিমরা ঈমানদার বলে দাবি করতে পারবেতো ?

মাওঃ নুরুল ইসলাম ওলীপুরীঃ ওলীপুরী সাহেব মাওলানা মাওদুদী (রঃ) ও জামাআতে ইসলামীর নিন্দা করে বলেন- আরেক প্রকার দালাল জামাআতে ইসলামী সারাক্ষণ সাহাবাদের সমালোচনায় লিপ্ত (মাওয়ায়েজে ওলীপুরী পৃঃ ১২৬) ওলীপুরীর উপোরক্ত অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন। জামাআতে ইসলামীর লোকেরা কোথাও সাহাবাদের সমালোচনা করেছেন তার প্রমাণ নেই। মাওঃ মওদূদী (রঃ) এর লেখা খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থে ঐতিহাসিকদের রেফারেন্স দিয়ে সাহাবাদের পর্যালোচনা করেছেন। এ পর্যলোচনায় মাওঃ মওদূদীর ভুল হতে পারে কেননা সেও একজন মানুষ।

সে জন্যেই জামাআতে ইসলামী মাওঃ মওদূদী (রঃ) কে ভুলের উর্ধ্বে মনে করেন না। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁকে অনুসরণও করে না এবং মাওঃ মওদূদী

এর ভুল কথা গুলো নিয়ে চর্চাও করেন না। কিন্তু দেওবন্দীদের ভূল আক্বীদা নিয়ে অলীপুরীরা চর্চা ঠিকই করে। মওদূদী সমালোচক তাকী উসমানী, মাওঃ মওদূদীর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন যে, মাওঃ মওদূদী বলেছেন মুয়াবীয়া (রাঃ) পুত্র ইয়াযিদকে মনোনয়ন দানের প্রাথমিক চিন্তা ভাবনার পিছনে কোন সৎ অনুভূতি বা উদ্দেশ্য ছিল না। মওদুদী এর উদ্বৃতির জবাব দিতে গিয়ে তাকী উসমানী বলেন- পরিষ্কার ভাষায় তাকে আমরা বলে দিতে চাই যে, যুক্তি ও পরিণতির বিচারে মুয়াবীয়া (রাঃ) এর এ পদেক্ষপকে ভুল ও ক্ষাতিকর বলার সুযোগ থাকলেও তাঁর নিয়তের উপর হামলা করার অধিকার কোন হালাল সন্তানের নেই (ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবীয়া রাঃ পৃঃ ১০৬ তাকী উসমানী) বিজ্ঞ পাঠক দেখলেন তো ? মাওঃ মওদূদীর বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে এক পর্যায় তিনি মাওঃ মওদূদীকে জারজ সন্তান বলতেও কণ্ঠোবোধ করেননি। কোন ভদ্র লেখক এরুপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারে কি ? আমরা মাওঃ মওদূদী সম্পর্কে মাওঃ মওদূদী এর সমালোচক ড. গালিবের মন্তব্য টি এর সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাই। মাওঃ মওদুদীর বিভিন্ন বিষয়ে বেশুমার লেখনীর অধীকারী ছিলেন। ফলে অনেক কিছু ভুল হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। মাওঃ মওদুদীর নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন এবং তাফসীর তাফহীমুল কুরআন এর প্রথম সংস্কারণের অনেক বিষয় তিনি পরবর্তী সংস্কারণে সংশোধন করেছেন। (আততাহরীক সেপ্টম্বর ২০০৩ ইং) কিন্তু তাকী উসমানী ভারসাম্য আলোচনা করতে গিয়ে একে বারে মাওঃ মওদুদী এর গর্ভধারিনী স্বতী 'মা' এর উপর অপবাদ দিয়ে ফেললেন। এর জবাবে আমরা রাসুল (সাঃ) এর ঐ হাদীসটি স্মরণ করে দিতে চাই। রাসুল (সাঃ) বলেন- মানুষ অন্যের মাতা পিতাকে গালি দেয় তাহলে তার মাতা পিতাকে গালি দেয়। সে অন্যের মাকে খারাপ নামে সম্বোধন করে। তাহলে সে তার মাকে গাল মন্দ করল (বুখারী) প্রিয় পাঠক এবার দেখুন রাসূল (সাঃ) এর ভাষায় উক্ত অপবাদ কার উপর বর্তায় ? উল্লেখ্য যে, আমরা এ পর্যন্ত যত সমালোচক এর লেখাই পড়েছি। তা কেউ এ সত্য টুকু প্রকাশ করে নাই যে, খোলাফায়ে রাশেদা তো কোন ছেলেকে মনোনায়ন দেন নাই। হাসান (রাঃ) ফেৎনার ভয়ে খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকেন এ চুক্তিতে যে, সাহাবী আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ) এর পর হাসান (রাঃ) খলিফা হবেন। অথচ চুক্তি মুতাবেক হাসান (রাঃ) এর মৃত্যুতে হুসাইন (রাঃ) এর নাম মুয়াবীয়া (রাঃ) প্রস্তাব করেননি। তিনি প্রস্তাব করে দেখতে পারতেন ইসলাম জগতের অবস্থা কি ? কিন্তু তিনি তা না করে পুত্র ইয়াজিদকে মনোয়ন দিয়ে গেলেন।

ফলে নবীর পরিবার শহীদ হলো, শহীদ হলো হুসাইন (রাঃ) সহ কোলের শিশু আলী আজগর। ইয়াজিদ রাসূল (সাঃ) এর দৌহিত্র ও ফাতিমা (রাঃ) এর কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর নিরাপত্তা ও প্রাণ রক্ষার কোনো উদ্যোগ নেননি। এমনকি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তি মুলক ব্যবস্থা গ্রহণও করেননি। তেমনি ভাবে আমিরে মুয়াবীয়া (রাঃ) উসমান (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ এর অজুহাত খাড়া না করে নাজুক পরিস্থিতিতে আলী (রাঃ) এর সাথে একাত্বতা করে উসমান (রাঃ) এর হত্যার বিচার করার সহজ বিষয়কে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করে আরো জটিল করে তুলেন। কি অন্যায় করেছিল আলী (রাঃ) ? যার জন্য তাঁর খেলাফত এর স্বীকৃতি দিলনা মুয়াবীয়া (রাঃ)। ইয়াজিদের কি অন্যয় করেছিল ইমাম হোসাইন ? যার জন্য তাঁকে শহীদ হতে হলো ? সমালোচক ব্যাক্তিবর্গের দৃষ্টিতে ইমাম হুসাইন (রাঃ) কি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল ? এ বিষয় গুলি এড়িয়ে গিয়ে মাওঃ মাওদূদী (রঃ) এর দুর্বল পয়েন্ট গুলোর স্পর্শ করা হলো কেন ? আমরা রাসূলের সাহাবা হিসাবে মুয়াবীয়া (রাঃ) কে সাহাবার মর্যাদাই দেই এবং সাহাবার ছেলে হিসেবে ইয়াজীদকে তাবেয়ীর মর্যদাই দেই। কিন্তু তাঁদের বিরোধের বিষয়গুলির উপর পর্যালোচনা করি তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য তাদেরকে হেয় করার জন্য নয়। মাওলানা মওদূদী (রঃ)ও তাই করেছেন। পাঠক এখানে জানা আবশ্যক যে মাওলানা মওদূদীর সাথে সালাফীদের আমলের বেশ পার্থক্য আছে কেননা মাওলানা মওদুদী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। হানাফী মাযহাবের লোক হওয়া সত্বেও ওলীপুরী ও কাশেমীরা মাওলানা মওদূদীর বিরোধীতা করে কেন ? কারণ হলো-মাওলানা মওদুদী দেওবন্দীদের ভ্রান্ত আক্বীদার ঘোর বিরোধী ছিল। এই জন্যই তাঁর বিরোধীতা। ওলীপুরী বলেন- রাসূল (সাঃ) একমাত্র মাপকাঠি সাহাবাদের মাপকাঠি (জামাআতে ইসলামীর) মানায় দরকার নেই। (মাওয়ায়েযে ওলীপুরী-১২৭ পৃঃ) উল্লেখ্য যে ওলীপুরী কাশেমী ও দেওবন্দীদের আক্বীদা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ উভয়েই সত্যের মাপকাঠি। অথচ এটা সকলেরই জানা নবী আঃ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের মর্যাদা কখনো সমান নয়। কারণ নবী (আঃ) গণ আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সাহাবাগণ আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নন। নবীদের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তাই নবুওয়াতির দিক দিয়ে নবীগণ নির্ভুল বা ভুলের উর্ধ্বে। নবীগণ ওহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে তাঁদের কোন ভুল নেই। তাই তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। সাহাবাগণের উপরে ওহী নাযিল হয় নাই। তাঁরা ওহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নয়। তাই তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নয়।তাই

তাঁদের ভুল হয়েছে। এজন্য তাঁরা সত্যের মাপকাঠি নন। তবে তারা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতের মাপকাঠি। নবীদেরও ভুল হয়েছে তবে তা নবুওয়াতের দিক দিয়ে নয়। মানবিক দিক দিয়ে। আর এ মানবিক ভুলের কারণে নামাজে সাহু সিজদার প্রচলন হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন- সকল মানুষের ভূল আছে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত ২/২৩৪১) নবীগণ ভুল করেছেন (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত হাদীস নং ৫৫৭১) রাসুল (সাঃ) বলেন আমি ভুল করি যেমন তোমরা ভুল কর (বুখারী, মিশকাত হাদীস নং ১০১৬) আল্লাহ তায়ালা হলেন কুদ্দছ সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি ও দোষ হতে আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহর কোন ভুল নেই। অতএব সাহাবাগণকে নির্ভুল জানার অর্থই হল আল্লাহর জাগায় স্থান দেয়া আর এটাই শিরক। আবার সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলার অর্থই হলো রাসূল (সাঃ) এর মর্যাদার জায়গায় স্থান করে দেওয়া। আর এটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্তি। সাহাবাদের ভুল হয়েছে একথা বললে ওলীপুরী ও কাশেমীর দৃষ্টিতে জামাআতে ইসলামীরা দালাল হয়ে যায়, ভ্রান্ত দল হয়ে যায়, আর মওদূদী (রঃ)– হয়ে যায় মিস্টার মওদূদী। জাকির নায়েক হয়ে যায় মওদূদীর শিষ্য। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমীর গুরুজন কাশেম নানুতুবী যখন স্বয়ং আল্লাহর ভুল ধরেন। তখন নানুতুবীর দলের লোকেরা দালাল হয় না, আল্লাহর সমালোচক হয়না, ভ্রান্ত হয় না। এবং মিষ্টার নানুতুবীও হয়না। গোলাম মুহাম্মদ কাদিয়ানী খাতামুন্নাবীয়্যিনকে অস্বীকার করার কারণে যদি কাফের হয়। তাহলে নানুতুবী খাতামুন্নাবীয়্যিন অস্বীকার করলে কি হয় ? ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব বলবেন কি ? ওলীপুরী নিজেই বলেছেন তিনি নীল চশমা পরেন, জাকির নায়েকের জন্য চশমাটি খুলেছিলেন। আমরা ওলীপুরীকে বিনয়ের সাথে বলবো-"জাকির নায়েকের জন্য চশমাটি না খুলে নিজেদের গুরুজন তথা দেওবন্দীদের জন্য নীল চশমাটি খুলে দেখুন। নচেৎ ঈমানের সাথে সাথে আমলও হারাবেন। কেননা উপরোক্ত আক্বীদা কাদিয়ানীদের দেওবন্দীদের নয়। অথচ বহু আগেই উক্ত মতবাদ মুসলিম উম্মাহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। সাহাবাদের ভুল হয়েছে তার নমুনা দেখুন- ফকীহ আবু বকর বিন ইসহাক বলেন, ইবনে মাসউদ কুরআন ভুলে গেছেন। যে সম্পর্কে মুসলিমগণ মতভেদ করেন নি। তা হলো সুরা নাস ও সুরা ফালাক। রুকুর সময় দু হাঁটুর মাঝখানে হাত রাখা, যা রহিত হয়ে যাওয়ার পরও তা তিনি করতেন ভুলে যাওয়ার কারণে। ইমামের পিছনে দুজন দাঁড়ানোর নিয়ম ইবনে মাসউদ (রাঃ) ভুলে গেছেন। তিনি ভুলে গেছেন, রাসূল (সাঃ) কুরবানীর দিন ফজরের নামায ঠিক সময় মত

পড়েছেন। তিনি ভুলে গেছেন রাসূল (সাঃ) আরাফার ময়দানে কি নিয়মে নামায একত্র করেছেন। সিজদার সময় মাটির উপর কুনুই ও বাহু রাখার বিষয়টি ভুলে গেছেন তিনি। রাসুল (সাঃ) وماخلق الذكر والانثى আয়াতটি কিভাবে পড়তেন তা তিনি ভুলে গেছেন। (মাওয়াহেবে লাতিফা ১ম খঃ ২৬০ পৃঃ) যারা সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ভুলে যাওয়া বিষয় গুলি বিশেষ করে সুরা নাস, সুরা ফালাক কে কুরআনের অংশ হিসাবে মেনে না নেওয়া বিষয়কে মেনে নিবেন কি ? ওলীপুরী বলেন ঃ বিদায় হজ্বের দিন যদি শরীয়াতের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে বিধান দিলেন কি করে ? (মাওয়ায়েযে ওলীপুরী -৩৫৬) যারা মুসলমান তারা বিশ্বাস করে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ ও দ্বীন সমাপ্ত আল্লাহ পাক বলেন- আজ আমি তোমাদের দ্বীন তথা জীবন বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার দ্বীনের অবদান সমাপ্ত করলাম (মায়েদা-০৩) কিন্তু ওলীপুরী বিশ্বাস করে বহু সমস্যার সমাধান কুরআনে নেই হাদীসে নেই তাই কুরআন হাদীসে না থাকা বিষয়ের সামাধান মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদ করে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন- হে নবী তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করতে পারে নাই, যার সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি নাই (ফুরকান-৩৩) বর্ণিত আয়াত দ্বয়কে উপেক্ষা করে ওলীপুরী বলেন-দ্বীন ও শরীয়ত পরিপূর্ণ নয়। বিদায় হজ্বের পরে মুজতাহিদ ইমামদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। তাহলে ওলীপুরী দৃষ্টিতে কি আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপুর্ণ করে দিতে অক্ষম ছিলেন ? যার ফলে মুজতাহিদ গণের সাহায্য নিয়ে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন ? তা না হলে ওলীপুরী কি করে বলতে পারে "বিদায় হজ্বের দিন যদি শরীয়াতের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মুজতাহিদ গণ ইজতিহাদ করে বিধান দিলেন কি করে ?" আল্লাহ বলেন দ্বীন পরিপূর্ণ। ওলীপুরী বলেন দ্বীন অপূর্ণ। আল্লাহ বলেন সব সমস্যার সমাধান এই দ্বীনের মধ্যেই আছে। ওলীপুরী আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে বলেন- সব সমস্যার সমাধান দ্বীনের মধ্যে নেই। কিছু সমস্যার সমাধান মুজতাহিদগণের মধ্যেও আছে। পাঠক এবার বলুন- আল্লাহ ও ওলীপুরী এ দু'য়ের মধ্যে কার কথা ঠিক ? যদি বলি আল্লাহর কথা ঠিক। তাহলে ওলীপুরী কথা ভূল। আর যদি বলি ওলীপুরী কথা ঠিক তবে তো আল্লাহর কথা ভূল। ওলীপুরী গুরুজন নানুতুবী সরাসরি আল্লাহর ভুল ধরেছেন। আর ওলীপুরী আল্লাহর বাণী "আমি দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম" একথার ভুল ধরে বলেন- "বিদায় হজ্বের

দিন যদি শরীয়াতের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মুজতাহিদ গণ ইজতিহাদ করে বিধান দিলেন কি করে" বাহ ! কি চমৎকার। গুরু শিষ্যের কি অপূর্ব মিল। ওলীপুরী উক্ত গ্রন্থে বলেন- মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রায় দিয়েছেন। বিভিন্ন ভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এটাকি বিদায় হজ্বের আগে না পরে ? অনেক পরে। এ বাক্য দ্বারা ওলীপুরী বুঝাতে চেয়েছেন দ্বীন পরিপূর্ণ নয়। যা মুজতাহিদ গণের ইজতিহাদের দ্বারা বিদায় হজ্বের পরে পূর্ণ হয়েছে। পাঠক ওলীপুরী ভ্রান্তি কোথায় হয়েছে তা বুঝার জন্য মুজতাহিদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিতে হবে। ইমাম ইবনে হাজম বলেন- আসন্ন সমস্যার মীমাংসা কুরআন সুন্নাহ হতে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তিনিই মুজতাহিদ। আবার সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করার কাজকে ইজতিহাদ বলে। অর্থাৎ মুজতাহিদ এর কাজটি কুরআন ও সুন্নার ভিতর থেকেই নিতে হবে। বাইরে থেকে নয়। কোন ব্যক্তি বিশেষের মতকে ইজতিহাদ বলা যাবে না। অর্থাৎ ইজতিহাদটি কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে। ইমাম সুফযান বিন ওয়ায়না বলেন-ইজতিহাদের তাৎপর্য হচ্ছে বিদ্বান গনের পরামর্শ। ব্যাক্তিগত অভিমতের নাম ইজতিহাদ নয়। এবার ওলীপুরী আমরা পাল্টা প্রশ্ন করি। হাদীস কখন এসেছে ? বিদায় হজ্বের আগে না পারে ? উত্তর সোজা বিদায় হজ্বের আগে। সেই হাদীসেই মুজতাহিদের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাই বলা চলে মুজতাহিদ কুরআন সুন্নাহর বাইরের বিষয় নয় বরং কুরআন সুন্নার মধ্যেরই বিষয়। তাই আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ। বাকী থাকল ইজতিহাদের বিষয়। এখানে ওলীপুরী মারাত্মক ভ্রান্তি ঘটেছে। ইজতিহাদের সজ্ঞা না জানার কারণে। ওলীপুরী দৃষ্টিতে ইজতিহাদ বিদায় হজ্বের পরে ঘটেছে বিধায় বিদায় হজ্বের আগে দ্বীন ছিল অসম্পুর্ণ। কিন্তু ওলীপুরী যদি ইজতিহাদের সংজ্ঞাটি পড়ে দেখতেন যাতে লিখা আছেঃ আসন্ন সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ হতে বের করার কাজটি হল ইজতিহাদ। এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে- কুরআন সুন্নাহ হতে বের করা অর্থাৎ কুরআন সুন্নার বাইরে ইজতিহাদ নেই। কুরআন ও সুন্নার মধ্যেই ইজতিহাদ সীমাবদ্ধ। তাই আমরা সহজে বলতে পারি "আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ।" বাকী থাকল ভূল ইজতিহাদ ও শুদ্ধ ইজতিহাদের বিষয়। কেনান রাসূল (সাঃ) বলেছেন- কোন জ্ঞানী গবেষণা করে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধন্তে উপনীত হলে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব পক্ষান্তরে গবেষণায় যদি ভুল হয়, তাহলে একটি সাওয়াব।

ভুল ইজতিহাদ হল কোন মুজতাহিদ সমস্যা সমাধানে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অর্থ ও মর্ম বুঝতে ভুল করে বসে। আর সেটাকে শুদ্ধ মনে করে সমাধান দেয়। সেটি ভুল ইজতিহাদ। আর এ ভুল ইজতেহাদের জন্য মুজতাহিদ ও তার অনুসারীরা এক নেকী পাবে। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন সুন্নাহ থেকে চেষ্টা সাধনা করে বের করেছে ফলে তার পারিশ্রমিক হিসেবে আল্লাহ পাক নেকী দান করবেন। কিন্তু উক্ত মুজতাহিদ অথবা তার পরের যুগের মুজতাহিদ গবেষনা করে উক্ত আয়াত ও হাদীসের সঠিক মর্ম অনুধাবন দ্বিবালকের মত স্পষ্ট করতে পারে এবং চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌছতে পারে যে পূর্বের ইজতিহাদ ভুল। তাহলে পূর্বের ইজতেহাদের উপর আমল করলে সওয়াব হবে তো দূরের কথা বরং বড় গুনাহ হবে। এককথাই তখন ঐ ইজতেহাদের কাজটির উপর আমল করা যায়েজ হবে না। এতে প্রমাণিত হলো যে মুজতাহিদ ও ইজতিহাদ উভয় বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর বর্হিভূত বিষয় নয় বরং কুরআন সুন্নাহর মধ্যে থাকার বিষয়বস্তু। কেননা আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ। তাই ভূল ইজতিহাদ থেকে ফিরে আসা ওয়াজিব। সাহাবাদের বেলায়ও ভুল ইজতিহাদ থেকে ফিরে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই)স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই বিয়ে সিদ্ধ হবে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন' এতে আর দোষ কি একথা শোনার পর লোকটি উক্ত মহিলাকে (পূর্বতন শ্বাশুড়ীকে) বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তান লাভ করে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ)মদীনায় এলে তিনি উক্ত বিষয় সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বললেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং কুফায় ফিরে এসে ঐ ব্যক্তিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের নিকট গেলেন ও তাদেরকে ডেকে বললেন 'আমি যে ব্যক্তিকে তার পূর্বতন শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার ফতোয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি। (কিতাবুল মুসান্নাফ তাহক্কীক আব্দুল খালেক আফগানী বোম্বাই ভারত তিরমিযি নিকাহ অধ্যায়) কিন্তু ওলীপুরী বলেন ঃ মুজতাহিদের পরস্পর দ্বিমত হলে উভয় মতের সওয়াব আছে। সুতরাং প্রসিদ্ধ চারটি মাজহাবের প্রতিটি মাজহাব পালনে যে সওয়াব আছে তা রাসূলের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মাওয়ায়েজে ওলীপুরী পৃঃ ১৮৯) তাহলে ওলীপুরী সাহেব ইবনে মাসউদের উপোরক্ত ভুল ইজতিহাদ কে মেনে শ্বাশুরীকে বিবাহ করা বৈধ মনে করবেন কি? আবার ওলীপুরী মুজতাহিদের ইজতিহাদ বিষয়ক

হাদীসটি মাজহাবের সাথে যুক্ত করলেন।কেননা অলূপুরীর দৃষ্টিতে মাযহাবের চার ইমামই মুজতাহিদ (তদেব পৃঃ ১৯০) ওলীপুরী মুজতাহিদ হওয়ার প্রথম শর্ত হিসাবে বলেন, মুজতাহিদ হতে হলে উসুলে তাফসীর উসুলে ফিকাহর বিষয় জানার সাথে সাথে ত্রিশ পারা কুরআনের ব্যাখ্যা রাসূলের রেখে যাওয়া দশ লাখ হাদীস সনদ মতন এবং ইখতেলাফ, রিজাল শাস্ত্র কণ্ঠস্ত থাকতে হবে। এটি হলো মুজতাহিদ হওয়ার প্রথম ধাপ। পাঠক আসুন আমরা ওলীপুরী উপোরক্ত মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলি মাযহাবের ইমামদের মধ্যে ছিলো কিনা সে আলোচনায় আসি।

ইমাম নাসাঈ বলেন- ইমাম আবু হানিফা সামন্য কটি হাদীস বর্ণনায় প্রচুর ভূল করেছেন। (সিলসিলা ১ম খন্ড-৩৬৬) ইমাম ইবনে আদী বলেন- আবু হানিফা যত হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে মাত্র ১৯ টি হাদীস বিশুদ্ধ ছিল। (প্রাগুক্ত ১ম খন্ড-৪৬৬) আর যাই হোক ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর যে দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল না একথা সত্য। আবার ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রঃ) হাদীস জগতের সম্রাট ছিল। তাঁর জাল যঈফ এবং সহীহ হাদীস সহ প্রায় দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিসের এত সংখ্যাক হাদীস মুখস্ত ছিল না। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বাল (রঃ) এর মুখস্থ কৃত দশ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে তাঁর লেখা মুসনাদে মাত্র ৩০ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) এর দশ লক্ষ হাদীস এর অনেক হাদীসই রাসূল (সাঃ) এর হাদীস ছিলনা। মুহাদ্দীস সম্রাট ইমাম বুখারী (রঃ) এর জাল জঈফ এবং সহীহ সহ ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল। তা থেকে মাত্র কয়েক হাজার হাদীস তাঁরা সহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করেন। আর ওলীপুরী সাহেব বলেছেন- মুজতাহিদের প্রথম ধাপ হলো রাসূল (সাঃ) এর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকা। তাহলে কি অর্থ দাঁড়াল ? ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিলনা। তাই তিনি মুজতাহিদ না। ইমাম আহম্দ বিন হাম্মলের দশ লক্ষ রাসূলের হাদীস মুখস্থ ছিল না। তাই তিনি মুজতাহিদ না। ইমাম বুখারী (রঃ) দশ লক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিলনা তাই তিনিও মুজতাহিদ না। অজ্ঞতার কোন পর্যায়ে পৌছলে একজন মানুষ এমন গাঁজাখোরী কথা বলতে পারে ? ওলীপুরীকে প্রশ্ন করি তাহলে পৃথিবীতে মুজতাহিদ কে ? মুজতাহিদ হতে হলে উপরোক্ত শর্ত লাগবে একথার ভিত্তি কোথায় ? ওলীপুরী সূত্র মতে- বলা চলে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন মুজতাহিদ আসে নাই। তাই যারা মুজতাহিদ নন, তাদের ইজতিহাদ মানা যায় কি করে ? ওলীপুরীর কথা

প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের প্রতিটি ইমাম মুজতাহিদ। তাই মাযহাব পালনে সাওয়াব আছে, একথার ভিত্তি রইল কোথায় ? দেখলেন তো মাযহাবের অন্ধ ভক্ত ওলীপুরী ইমাম চতুষ্টয়কে বড় করতে গিয়ে মুজতাহিদের শর্তের নামে কি কাল্পনিক কিচ্ছা তৈরী করলেন ? এমন কিচ্ছা শুধু ওলীপুরী বানিয়েছেন তা নয়, যুগ যুগ ধরে মাযহাবী অন্ধভক্তদের এরুপ কাল্পনিক কিচ্ছার প্রচলন চলে আসছে। যেমন- হানাফী মাযহাবের সুপ্রশিদ্ধ কিতাব আদদুররুল মুখতারের লেখক বলেছন, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আঃ ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী আমল করবেন। অথচ হযরত ঈসা (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়াহ মোতাবিক শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। (মুসলিম পৃঃ ২৫২) বর্ণিত হয়েছে : খিযির ('আ.) ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর পর তার কবর হতে পচিশ বৎসর জ্ঞান অর্জন করেছেন। (মুলাখখাস ত্বাহাবী, ক্বায়সারী) কবর থেকে জ্ঞান অর্জন করা এতো শিয়াদের আক্বীদা। শিয়াদের ধারণা মতে তাদের বার জন ইমামের কবর থেকে তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান এক ধাপ আগ বেড়ে স্বীয় অনুদীত তাফসীরে মারেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) সুরা মুহাম্মদের শেষ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে,উক্ত আয়াত আবূ হানীফা ও তার সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে তিনি আরো বলেন আবূ হানিফা (রঃ) ১৬ বৎসর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে হজ্ব করেন। এ সময়ই আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর পবিত্র মুখ থেকে সরাসরি একখানা হাদীস শ্রবণ করেন (মাসিক মদীনা নভেম্বর ১৯৯৩ ইং সংখ্যা প্রশ্ন উত্তর পাতা পৃষ্ঠা ৫৯)। ওলীপুরী ও কাশেমীকে বলছি-কোন মুসলমান ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে সাহাবী মনে করতে পারবে কি? রাসূল (সাঃ) এর ৭০ বছর পর যার জন্ম সে কি করে রাসূল (সাঃ) এর মুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করে?

মাওঃ রাশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহীর

গাঙ্গুহী বলতেন এ যুগে হেদায়াত ও নাজাত আমারই অনুসরণীয় উপর সীমাবদ্ধ। (তাযকিরাতুর রাশিদ ২য় খন্ড ১৭ পৃঃ) গাঙ্গুহী উক্ত দাবি দ্বারা বুঝা যায়, তিনি নবুওয়াতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে চান। তিনি বলতেন রাহমাতুল্লীল আলামীন শব্দটি রাসূল (সাঃ) এর বিশেষ গুণ নয়। (ফতোয়ায়ে রাশিদিয়া উর্দূ ২য় খন্ড ৯ পৃষ্ঠা) অথচ একথা সমস্ত মুসলামনই জানেন যে, কেবল মাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ রাহমাতুল্লিল আলামীন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। (সুরা আম্বিয়া- ১০৪) গাঙ্গুহীর এরুপ বিশ্বাসের ফলে তার পীর মাওঃ ইমদাদুল্লাহ

মুহাজির মক্কীর মৃত্যুতে গাঙ্গুহী বার বার বলছিলেন, হায় রাহমাতুল্লিল আলামিন! হায় রাহমাতুল্লিল আলামিন! পাঠক ভেবে দেখুন রাসূল (সাঃ) এর বিশেষ গুণ রাহমাতুল্লিল আলামিন কে পীরের নামে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন মুসলিম ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর অন্য কাউকে রাহমাতুল্লিল আলামিন মেনে নিতে পারবেন কি ? কিন্তু এখানে গাঙ্গুহী ভক্ত ওলীপুরী ও কাশেমী কিছুই বলেন না। কিছু না বলার অর্থ কি এই নয় যে, ওলীপুরী ও কাশেমী নিজেই গাঙ্গুহীর মত রাহমাতুল্লীল আলামিন তার পীরদের জন্য ব্যবহার বৈধ মনে করেন। রাসূল (সাঃ) এর বিশেষ গুণ পীরদের শানে ব্যবহারে বিশ্বাস করলে মুসলিমদের ঈমান ঠিক থাকবে তো? ওলীপুরী ও কাশেমীকে বলছি-" ঈমানী সাহস থাকলে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে না লিখে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে লিখুন। কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব তা লিখবেন না। কেননা এটা তাদের আক্বীদা, জাকির নায়েকের আক্বীদা নয়। এ জন্যই ওলীপুরী ও কাশেমী জাকির নায়েকের বিরোধীতা করে।

মাওঃ আশরাফ আলী থানবী

মাওঃ আশরাফ আলী থানবী (জন্ম ১২৮০হিঃ) । একবার তার মুরীদ নিজের স্বপ্ন তাকে লিখে পাঠান। তা হচ্ছে এই যে, আমি রাতে স্বপ্নে নিজেকে দেখলাম যে আমি অনবরত কালিমায়ে শাহাদাত সঠিক পড়ার চেষ্ঠা করছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই লা-ইলাহা ইল্লালাহর পর আশরাফ আলী রাসূলুল্লাহ বেরিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই আমি স্বপ্নে থেকে জেগে উঠলাম। কিন্তু শরীরে রীতিমত অসাড় ভাব ছিল এবং ব্যক্তিহীনতাও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় কালিমার ভূলটা যখন মনে পড়ল, তখন একবার ইচ্ছা হল যে, ঐ ধারণাটি মন থেকে দুর করা যাক। এই ভেবে বারান্দায় বসে পড়লাম। পুনরায় অন্য পাশ ফিরে শুয়ে কালিমার ভূলটার সংশোধনে রাসূল (সাঃ) এর দুরুদ পড়ি। কিন্তু তার পরও আমি বলছি আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যীনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী। পাঠক মুরিদের ঐ চিঠি দেখে মাওঃ আশরাফ আলী থানবী মুরীদকে এই জওয়াব লিখে পাঠান- ইস ওয়াকিয়া মেঁ তাসাল্লি থি জিসকী, তারাফ তুস রুজু কারতে হো, উতহ বেআওনিহী তা,আলা মুত্তাবিয়ে সুন্নাত হ্যায়, এই বক্তব্যের সান্তনা ছিল, যার দিকে তুমি রুজু করছ। আল্লাহর মদদে সুন্নাতের অনুসারী (রিসালাহ আল ইমদাদিয়া ১৩৩৫ হিঃ ৩৪ পৃঃ) পাঠক দেখুন, মাওঃ থানবী (রঃ) মুরীদকে সোজা উত্তর দিতে পারতেন যে, এটা সম্পূর্ণ কুফরী কালেমা এ থেকে তুমি তওবা কর। তা না বলে মাওঃ থানবী মুরীদকে

বলে দিলেন আমার প্রতি তোমার অত্যান্ত ভালবাসা আছে, আর এসব এরই পরিনাম ও ফল। (মাসিক বুরহান দিল্লী ১৯৫২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১০৭ পৃঃ) থানবী ভক্ত ওলীপুরী ও কাশেমী থানবীকে নবী মানবেন তো ? থানবীকে নবী মানলে ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব পাক্কা ঈমানদার হতে পারবেন তো ? উপরোক্ত পচা আক্বীদার কথা বলতেও লজ্জা লাগে। এর পরেও উক্ত হাকীমুল উম্মত থানবীর জন্য ওলীপুরী কাশেমী ও তাক্বী ওসমানীর এত কান্না কাটি ? উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার না করায় জাকির নায়েক এর প্রতি ওলীপুরী ও কাশেমীর এত রাগ এত ক্ষোভ ?

তাবলীগে নিসাবের লেখক মাওঃ জাকারিয়া

মাওঃ জাকারিয়া লিখেছেন কোন যুবককে দরুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে যুবকটি বলেন- আমি আমার মায়ের সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে মারা যান, তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং তার পেট ফুলে যায়, যার ফলে আমি অনুমান করলাম যে, কোন বড় গুনাহ হয়েছে। তাই আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দুয়ার জন্য হাত তুললাম। ফলে দেখলাম যে, তাহামা (হিজায) থেকে এক খন্ড মেঘ এল। তা থেকে একজন লোক বের হল। তিনি তার হাতটি আমার মায়ের মুখে ফেরালেন। যার কারণে তা উজ্জল হয়ে গেল। তার পর পেট ও হাত ফেরালেন। ফুলাও সম্পূর্ণ দুর হয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে ? যিনি আমার ও আমার মায়ের বিপদ দুর করলেন? তিনি বললেন আমি তোমার নবী মোহাম্মদ (সাঃ)। আমি বললাম আমাকে কোন ওয়াসিয়্যাত করুন। রাসূল (সাঃ) বললেন, যখনি তুমি কোন পা রাখবে কিংবা তুলবে তখনি পড়বে আল্লাহুমা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মোহাম্মদ। (ফাযায়িলে দরুদ পৃঃ ১২৬) রাসূল (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর রাসূল (সাঃ) এর পক্ষে কারো বিপদে গায়েবি খবর জেনে এবং রাসূল (সাঃ) ইন্তিকালের পর মেঘের মধ্যে দিয়ে রাসূল (সাঃ) হাজির হয়ে কারো বিপদ থেকে উদ্ধার করার ভ্রান্ত আক্বীদা শিরক নয় কি ? জাকারিয়া ভক্ত ওলীপুরী নিজেই বলেছেন রাসূল (সাঃ) কে যে ব্যক্তি আলিমুল গায়েব বিশ্বাস করবে সে কাফের। (মাওয়ায়েজে ওলীপুরী পৃষ্ঠা-২৭৯) ওলীপুরী ও কাশেমীর উক্ত ফতোয়া অনুপাতে তাবলীগে নেসাবের লেখক দেওবন্দী আলেম মাওলানা জাকারিয়া ও তার অনুসারীদের অবস্থা কি ? ওলীপুরী ও তাবলীগ ভক্তরা বলবেন কী ? মজার ব্যাপার হলো ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেব নিজেই প্রচলিত তাবলীগে বিশ্বাসী। এরাই নাকি জাকির নায়েকের চেহারা খোজা খুজি করে, নিজেদের চেহারা না দেখে অন্যের চেহারা খোজা বাতুলতার

বহিঃ প্রকাশ নয় কি ? মাওঃ জাকারিয়া লিখার শুরুতে শিরকের আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বলেন যে, ওলামায়ে কিরাম ও সূফীকুল শিরোমনি, মুজাদ্দিদে দ্বীন মাওলানা ইলিয়াস আমাকে আদেশ করেন যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীস অবলম্বনে যেন একটা সংক্ষিপ্ত বই লিখি। এত বড় বুযুর্গের সন্তুষ্টি বিধান উক্ত কাজে সচেষ্ট হই। (তাবলীগী নিসাব ভূমিকা পৃঃ ৩) ইসলামী আক্বীদা হল, মু'মিন যা করবে তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন : 'নিশ্চয় আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে, বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এর দ্বারা সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। (বুখারী ও মুসলিম) সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে ইলিয়াসের সুন্তুষ্টি চাওয়া সম্পূর্ণ শির্ক। এরূপ আক্বীদা নিয়ে ওলীপুরী ও কাশেমীর এত বড়াই। মাওলানা জাকারিয়া অন্য পাতায় লিখেন সূফী হাতিম আসাম্ম, রাসূল (সাঃ)-এর কবরে হাজির হয়ে শুধু এ কথাটুকু আরজ করেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিও না। গায়েব হতে আওয়াজ আসল, আমি তোমাদেরকে মাহবুবের কবর যিয়ারতের জন্যই নসীব করেছি যে, তা কবূল করব। যাও আমি তোমার এবং তোমার সাথে যত লোক এখানে হাজির হয়েছে সকলের গুনাহ মাফ করে দিলাম। (ফাযায়েলে হজ্ব পৃঃ ১৫০) সম্মানিত পাঠক রাসূলের ইন্তিকালের পর তাঁর মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করা মাজার পূঁজারীদের সাদৃশ নয় কি? এবং গায়িবী আওয়াজ শুনা তো নবুওয়াতের কাজ, সূফী হাতিম নবী ছিলেন না তো ? মাজার পূজাঁ গায়েবী আওয়াজ শুনা কি তাওহীদী শিক্ষা ? তাছাড়া আমরা জানি এ জাতীয় গায়েবী খবর আহমাদী জামাতের কাদীয়ানীরা গোলাম আহম্মাদ কাদীয়ানী সম্পর্কে বিশ্বাস করে। (কুআনের চিরন্তন মুজেজা পৃঃ ৫৫ ড. মজিবুর রহমান।) তাহলে কি ওলীপুরী ও কাশেমীর তাবলীগী জামআত কাদিয়ানী দ্বারা প্রভাবিত মাওঃ জাকারিয়া আরো লিখেন সূফী সাইয়্যিদ আহমাদ রিফাই হাজ্জের পরে ৫৫৫ হিঃ তে রাসূল (সাঃ)-এর রওজা মোবারকে সালাম পৌছালে সালামের জওয়াব শুনার পাশা পাশি হাত দিয়ে মুসাফা ও চুমু খেয়ে ছিলেন। তাবলীগী নিসাব এর লেখক শাইখুল হাদীস যাকারিয়া এক ধাপ বাড়িয়ে বলেন যে, ঐ সময়ে প্রায় ৯০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে আব্দুল কাদের জিলানী ও ছিলেন। (ফাযায়েলে হজ্ব পৃঃ ১৪১) মাওলানা মাহমুদুল হাসানের হায়াতে রেফায়ী গ্রন্থের অনরূপ কথা লিখেছেন। পাঠক দেখুন ৫৫৫ হিঃ তে ইহুদীরা রাসূল(সাঃ) এর মৃতদেহ চুরি করার ফন্দি এটেছিল। এ দুঃসময়ে তৎকালীন বাদশা নুরুদ্দিন জঙ্গি (রঃ) কে রাসূল (সাঃ) চক্রান্ত কারী তিন জন ইহুদীর ছবিসহ স্বপ্নে দেখান। জঙ্গি

(রঃ) স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে উক্ত ইহুদীদেরকে ধরার উদ্দেশ্যে বাগদাদ হতে ষোল হাজার অশ্বারহী সৈন্য নিয়ে মদীনা ঘেরাও করেন। এবং মদীনা বাসীদের জন্য ভোজের আয়োজন করেন। তাদেরকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে বিশেষসূত্রে তাদের কে বন্দী করতে সক্ষম হন। অবশেষে চক্রান্তকারী ইহুদীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে একাজ সমাপ্ত করতে নুরুদ্দীন জঙ্গী (রঃ) এর প্রায় ছয় মাস লেগে যায়। তিনি মদীনাতে অবস্থানকালে এ বিপদ মুহূর্তে রাসূল(সাঃ) স্ব-শরীরে সাক্ষাত বা উপরোক্ত বিষয় বলে দেননি কেন? আর তখন বলে দেয়াটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। মজার ব্যাপার হল সূফী রেফায়ির জন্মস্থান ইরাকে ছিল। ঘটনাটি ছিল একই হিজরীতে। তখন রেফায়ি ছিল কোথায়? উপরোক্ত ধারণাগুলো কি তাওহীদী ধারণা? নবী তাঁর রওজা থেকে স্বশরীরে জাহির হওয়া বিষয়টি যে শিরকের দিকে নিয়ে যায় তা সুস্পষ্ট। নূরুল ইসলাম ওলীপুরী হানাফী কিতাব কাজী খাঁ আলমগীরের বরাত দিয়ে বলেন- যদি কোন ব্যক্তি স্বাক্ষী ছাড়া কোন মেয়েকে বিয়ে করে বলে যে, আমি আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ) কে স্বাক্ষী করলাম, তবে সে কফুরী করল। কারণ সে আল্লাহর সঙ্গে রাসূল (সাঃ) কেও হাজির নাজির গণ্য করেছে। (মাওয়ায়েজে ওলীপুরী -২৭৭ পৃষ্ঠা) ওলীপুরী উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী মাওলানা জাকারিয়া কি ? উক্ত ফতোয়া জানার পরও ওলীপুরী ও কাশেমী অন্ধ ভাবে জাকারিয়ার প্রচলিত তালীগ করে যাচ্ছে। পাঠক ওলীপুরী কাশেমী ও জাকারিয়ার তাবলীগের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে কি হেদায়াত পাওয়া সম্ভব ? কোন বন্ধ্যা নারী থেকে যেমন সন্তান পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনি ওলীপুরী ও কাশেমীর তাবলীগী আক্বীদা থেকে কোন হেদায়েত পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলি বিদআতের প্রাদুর্ভাব ওলীপুরী ও কাশেমীর তাবলীগী জামাআত হলো বন্ধ্যা প্রেমিকা।

মাওঃ তাকী ওসমানী

তাকী ওসমানী তার লেখা হৃদয় ছোঁয়া কাহিনী গ্রন্থের ১১ পৃঃ বলেন- রেফায়ী রাসূল (সাঃ) পবিত্র রওজায় উপস্থিত হয়ে কবিতার কয়েকটি চরণ তার মুখ থেকে বের করলেন- যার অর্থ হলো- হে রাসূল (সাঃ) আমি যখন দুরে ছিলাম তখন আমি আমার আত্মাকে আপনার খেদমতে পাঠাতাম। আমার আত্মা আমার প্রতিনিধি হয়ে মদীনার মাটি চুমু খেত। আজ আল্লাহর অনুগ্রহে আমি স্ব শরীরে উপস্থিত। আপনি দয়া করে আপনার হস্ত মোবারক প্রসারিত করুন, যেন আমার ঠোঁটদ্বয় তা চম্বুন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। এর পর তাকী ওসমানী বলেন- হযরত রেফায়ী এই কবিতা আবৃত্তি করার সাথে সাথে পাক রওজা হতে

রাসূল (সাঃ) পাক হাত মোবারক বাড়িয়ে দেন। এর পর তাকী ওসমানীর মন্ত ব্যঃ ইতিপূর্বে যা কাউকে করেননি। অর্থাৎ রেফায়ীর মত রাসূল (সাঃ) এর হস্ত চম্বুন আর কেউ করেন নি। বাহ ! গুরু ও শিষ্যর কি অপূর্ব মিল। অথচ তাদেরই অলী ফরীদ উদ্দীন আত্তার এর লেখা তাযকেরাতুল আউলিয়া গ্রন্থের ১ম খন্ডে ২০৯ পৃঃ বলা হয়েছে- ইমাম আবু হানিফা (রঃ) রাসূল (সাঃ) এর রওজায় উপস্থিত হয়ে বললেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া সায়্যিদাল মুরসালীন তখন রওজা মোবারক থেকে জবাব আসল ওয়াআলাইকুমুস সালাম ও ইয়া ইমামুল মুসলিমীন ইত্যাদি। মানুষ মারা যাওয়ার পর রূহ কবরে থাকে না। রূহ যদি কবরে থাকতোই তাহলে মুনকার নাকীররের জন্য কবরে রূহের আগমন ঘটত না। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে মানুষ মারা যাওয়ার পর রূহ ইল্লিন ও সিজ্জিন অথবা যেখানে ছিল সেখানে চলে যায়। তাহলে কবরে সে রুহকে কবিতা শুনালে বা রূহের কাছে প্রার্থনা শুনালে লাভ কি ? আল্লাহ বলেন- তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না। (রুম-৬২) আবার রেফায়ী রাসূল (সাঃ) এর কাছে আত্মাও প্রেরণ করেছেন। কেউ কি মৃত ব্যাক্তির নিকট নিজের আত্মা প্রেরণ করতে পারে ? দুনিয়ার জীবন থেকে বরযখি জীবনে ? আত্মা প্রেরণ করে যোগাযোগ রক্ষা করা চম্বুন করা কি ইসলামী আক্বীদাহ ? কোন সাহাবী এরুপ দাবি করেছেন কি ? এই কথা গুলো গুরু শিষ্য মাওলানা জাকারিয়া ও তাক্বী ওসমানীর মাথায় আসে নাই। রাসূল (সাঃ) যদি কবর থেকে শুনতে পারতেন, জবাব দিতে পারতেন অথবা উঠে আসতে পারতেন- তাহলে আয়শা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এর মধ্যে এবং আলী (রাঃ) ও মুয়াবীয়া (রাঃ) এর মধ্যে হুসাইন (রাঃ) ও ইয়াজিদ এর মধ্যে দন্দ্ব ও যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) রওজা থেকে শতর্ক করলেন না কেন ? আওয়াজ দিলেন না কেন ? উঠে আসতে পারলেন না কেন ? তিনি কি পেরে আসলেন না ? না নাপেরে আসলেন না। যদি বলা হয় পেরে আসেননি। তাহলে তো রাসূল (সাঃ) অন্যায় করেছেন। এ আক্বীদা কি রাখা যাবে ? আর যদি বলেন- না পেরে আসেননি তাহলে ওলীপুরী কাশেমী ও তাক্বী ওসমানী এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা প্রচার করেন কেন ? এসব মিথ্যা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছেন কেন ? পাঠক এদের অলীদের সাথে রাসূল (সাঃ) কবর থেকে অহরহ মুসাফা করেন। কওমী মাদরাসার বেশকয়েক জন আলেমের নিকট শুনেছি হুসাইন আহম্মদ মাদানীর জন্য রাসূল (সাঃ) কবর থেকে উঠে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। জানিনা দেওবন্দী গ্রুপের আলেম তাক্বী ওসমানী ওলীপুরী ও কাশেমী, আজিজুল হক মারা গেলে এদের ভক্তগণ এরূপ কত কিচ্ছায় না তৈরী করবে তা আল্লাহই জানে।

মাওঃ হুসাইন আহম্মদ মাদানী

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কি ইসলামী মতবাদ? যে দলের নেতা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদী কংগ্রেস এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে (হুসাইন আহম্মদ এর পুত্র জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা) আন্তার্জাতিক অলি নামে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ আসাদ মাদানী ১৯৬৫ সনে তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন- "ইসলাম স্টেট বানানে নেহি আয়া হায়, ইসলামি হুকুমত উহা খিচে জাহা নিনানুব্বে ছে ফি ছাদ মুসলমান হে।" অর্থাৎ ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আসে নি। ইসলামী রাষ্ট্র সেখানে কায়েম করুন, যেখানে শতকরা ৯১ জন মুসলমান বাস করে। তার এ বক্তৃতাটি দিল্লির "আল জমঈয়ত' পত্রিকার বরাত দিয়ে দৈনিক পাসবান পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। হিন্দু কংগ্রেস নেতা মিস্টার গান্ধী ও মিস্টার নেহরুর কাঁধ মিলিয়ে উক্ত অলীর পিতা হুসাইন আহমদ মাদানী ঘোষণা করেন যে, হিন্দু মুসলিম এক জাতি। ১৯৩৮ সনে লাহোর শাহী মসজিদে বক্তৃতাকালে মাওলানা মাদানী ইসলামের দলীল পেশ করে দাবী করেন যে, ভারতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বুদ্ধ, খৃস্টান সবই এক জাতি। এ বিষয়টি নিয়ে তিনি একটি বই লিখেন। যার নাম 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' যার ফলশ্রুতিতে কবি আল্লামা ইকবাল ফার্সী ভাষায় নিম্নের কবিতার মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন-

আজম হনযনা দানিস্ত রমুযে দ্বীন ওয়ারনা,
যে দেওবন্দ হুসাইন আহমদ ইচেঁবুল আজবিস্ত?
সরুদে বরসরে মিম্বর কে মিল্লাত আযওয়াতানাস্ত
চেবে- খবর আয্ মাকামে মুহাম্মাদে আরাবিস্ত?
বমুস্তাফা বরে সাঁ খেশরা কেঁদী হামা উস্ত-
আগার বাউনা রাসিদী তামামে বুলাহাবিস্ত।

বুঝেনি ঐ আজমবাসী দ্বীনের মর্ম বিহ্বলতা
দেওবন্দে তাই তো হুসাইন আহমদ কন আজব কথা।
ওয়াতান থেকে মিল্লাত হয়, এ কথা ফের গান যে তিনি
বুঝেন নি হায়! নবীর মুকাম, আল আরাবীর মান যে তিনি।
নবীর কাছে পৌছিয়ে দাও, নিজেকে, এই দ্বীনের দাবী,
পৌছাতে না পাড় যদি, সবই হবে বু-লাহাবী॥

পরবর্তীতে ১৯৩৯ সনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলাম ও জাতীয়তা বাদ টুনেশন থিউরী বই লেখেন। হুসাইন আহম্মদ মাদনী (রঃ) মাকামে নবুয়াত

সম্পর্কে ওলামায়ে দেওবন্দ ও কাশেম নানুতুবির দৃষ্টি ভঙ্গি পেশ করে তার মতামত ব্যক্ত করে বলেন- মাকামে নবুয়াত সম্পর্কে আমাদের আকাবেরীণে দেওবন্দের ধরাণা- হুজুর (সাঃ) আদিঅন্ত এলাহী ফারজিয়াতে অধিষ্ঠিত। তাদের আক্বীদা সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের রহমত হচ্ছে এবং হবে সে নিয়ামত চায় বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য হোক অথবা অন্য কিছু হোক সকল কিছুতে নবী (সাঃ) এর ফায়েজ এমন যেমন সূর্যের আলো চাঁদের প্রতিফলন এবং চাঁদ থেকে হাজারো আয়নায় বিস্তৃত হয়। মোট কথা মুহাম্মাদী হাকীকতই সমস্ত বিশ্ব জুড়ে একমাত্র সেতু বন্ধন। (আস সিহাবুস সাকিব) বিশ্বের সকল নবী (আঃ) এবং নবুয়াতি ফায়েজ নিজ উম্মত পর্যন্ত পৌছিয়ে থাকেন তাহলে মহাগ্রন্থে আল্লাহর বানী "এমন অনেক নবী আছেন যাদের কথা আপনাকে অবহিত করা হয় নাই।(সুরা নিসা ১৬৪) নবী (সাঃ) কে জানানোই হয় নাই। তবে কিভাবে তিনি জাতী নবী ? আর নবীগণই বা কিভাবে তার থেকে ফয়েজ লাভ করলেন। আদম (আ) এর পুর্বে যদি তাকে জাতী নবীর ঘযোনা করে থাকে তবে নুজুলে কুরআনের পুর্বে কিভাবে তিনি ইমান ও কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। আল্লাহর বাণী এই ভাবেই আমি আপনার প্রতি ওহী নাযিল করেছি। ইতিপুর্বে কিতাব কি? ঈমান কি? আপনি অজ্ঞাত ছিলেন। (আশশুরা-৫২) পাঠক এবার দেওবন্দী আক্বীদা সম্পর্কে একটু ভাবুন। এটা কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা? (কিয়া ওলামায়ে দেওবন্দ আহলে সুন্নাত হ্যায়- পৃঃ ২৩/২৪ সাইয়্যেদ তাওসিফুর রহমান রাশেদ) এখানেই ওলীপুরী ও কাশেমীর সাথে জাকির নায়েকের পার্থক্য কারণ উপরোক্ত আক্বীদায় জাকির নায়েক বিশ্বাসী নয়।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরি

মাওলানা থানবী এর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে ফরিদপুরি বলেন- থানবীর পিতার কোন পুত্র সন্তানই জীবিত থাকতো না। একদা তিনি হাফিজ গোলাম মুর্তুজা সাহেব এর খেদমতে এ বিষয়টি আরোজ করেন। হাফিজ সাহেব বললেন উমার ও আলীর টানা টানিতেই পুত্র সন্তান গুলো মারা যায়। এবার পুত্র সন্তান হলে আলীর সোপর্দ করে দিও। ইনশাল্লাহ জীবিত থাকবে। হাফিজ সাহেব বলেন- এর গর্ভে দুটি ছেলে হবে, ইনশাল্লাহ উভয়ে বেঁচে থাকবে এবং ভাগ্য ভাল হবে। একজন হবে আমার অনুসারী অন্যজন হবে দুনিয়াদারী, বাস্তবে তাই হয়েছিল। ইত্যাদি পুস্তকটি পৃষ্ঠা এক পড়লে জানা যায় যে, আশরাফ আলী থানবীর পিতৃ পুরুষ উমার (রাঃ) এর এবং মাতৃকূল আলী (রাঃ) থেকে। থানবী সাহেবের

পিতার কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকতো না। উমর (রাঃ) এর নাম অনুসারে নাম রাখার কারণে, ফলে উমার ও আলীর টানা টানিতে পুত্র সন্তান গুলি মারা যায়। উপরোক্ত বাক্যগুলোর মধ্যে উমার (রাঃ) ও আলীর (রাঃ)এর জীবন দান, মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা ও একে অপরের মধ্যে রেশা রেশির কথা এবং উমার (রাঃ) থেকে আলী (রাঃ)সবল বা বলবান, অন্যথায় তারা মৃত্যু বরণ করার পরও জীবিত ইত্যাদি বিষয় প্রমাণিত। অথচ প্রত্যেক মুসলিম জানে একমাত্র আল্লাহই পারেন জীবন দান করতে এবং মৃত্যু ঘটাতে। (সূরা নাজম-৪৩) তাহলে উমার ও আলী (রাঃ) টানা টানি করে সন্তান গুলো মেরে ফেললেন কিভাবে ? মাওলানাঃ শামছুল হক ফরিদপুরির– এর মতে কি উমার ও আলী (রাঃ) এখনো জীবিত ? তাঁরা কি হাজির-নাজির? তাঁরা যদি মারতেই পারতো, তবে কেন কারবালার ময়দানে আলী (রাঃ) হোসাইন (রাঃ) এর শত্রুদেরকে মেরে ফেললেন না ? তাছাড়া উমর ও আলী (রাঃ) এর জীবদ্দ্যশায় এরূপ রেশারেশি ছিল কী ? পীর হাফিজ গোলাম মর্তুজা সাহেব কিভাবে গায়েবের খবর বলে দিলেন? সন্তান গর্ভে আমার পূর্বেই তিনি কিভাবে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, তার গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান হবে। তাহলে কি তিনি কোন নবী? যা ওহী আসার ভিত্তিতে বলে দিলেন। আবার সন্তানদের আগাম নাম রাখলেন,একজন এর নাম আশরাফ আলী অপরজনের নাম আকবর আলী। এ যেন রাম জন্মের পূর্বে রামায়নের কাহিনী লেখার মত। পীর শামছূল হক ফরিদপুরী অযোদ্ধার পড়শী কি ? তাই তিনি রামায়ন রচিয়িতা প্রবল কল্পনা বিশিষ্ট কবি বাল্মিকার সুন্নতের অনুসারণ করছেন কি ? আকবর আলী নাম রাখা কি জায়েজ ? মাওলানাঃ ফরিদপুরী ঐ হাদীস কি পড়েন নাই? রাসূল (সাঃ) কোন সাহাবীর নাম আকবর ছিল বিধায় পরিবর্তণ করে বাশীর রাখেন। (বুখারী তারিখুল কাবীর ১ম খন্ড ৯৮ পৃঃ) এ ফরিদপুরীর অন্ধ ভক্ত হলো অলীপূরী ও কাশেমী তাহলে তারা জাকির নায়েকের বিরোধিতা করবে না কেন ?

চরমোনাই এর পীর ফজলুল করিম

চরমোনাই এর পীর বলেন- পাগলা যদি আর একবার মাওলা বলে ডাক দিত, তবে আল্লাহ্ পাকের আরশ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত এবং কিয়ামত সংগঠিত হত। পাগলার ডাক মাওলার আরশেও সহ্য করতে পারতো না। (মাওয়ায়েজে কারিমিয়া ৩য় খন্ড ৪৬/৪৭ পৃঃ) পাঠক কোন লোকের ডাকে আল্লাহর আরশ ভেঙ্গে যেতে পারে কি? আল্লাহ পাক তাঁর আরশ রক্ষার ব্যাপারে এতই দুর্বল ? পীর সাহেব বলেন- শাম দেশের কুতুব বললেন- আমাকে কেন ডেকেছেন?

আমাকে তাড়া তাড়ি বিদায় দিতে হবে। শাম দেশে একটা গান হচ্ছে সে কারনে মাওলায় জমিন উল্টিয়ে দিতে পারে। আমাকে কিন্তু ধরে রাখতে হবে। (ঐ পৃঃ৪১) পীর ফজলুল করিম এর উক্ত বাক্যটি নিঃসন্দেহে কুফরি। এ কত বড় কুতুব! গায়ককে বাধা না দিয়ে, আল্লাহর কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ পাক কোন গ্রাম উল্টিয়ে দিলে, সে গ্রাম কোন ব্যক্তি ধরে রাখার বা বাধা দিবে, এরকম কথা বিশ্বাস করলে ইমান থাকবে তো ? আল্লাহ পাক কি এসব অলীদের নিকট এতই অসহায় ? তিনি আরও বলেন- বুড়োর ডাকে মাওলার রহমতের দরিয়া জোশ মেরে গেছে। হঠাৎ আকাশ থেকে ডাক দিয়ে মাওলায় বলেন, বুড়ো তুমি যতই কাঁদ আর মাওলাকে ডাক, তোমার নাম জাহান্নামে লেখা হয়ে গেছে (ঐ পৃঃ৮৮) ইসলামী আক্বীদা হল, আল্লাহ পাক কোন নবী রাসূল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন না। আল্লাহ্ পাক বলেন- কোন মানুষই এই মর্যদার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় ওহীর মাধ্যেমে, পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। (সুরা আশশুরা ৪১) তাই বলি ঐ বুড়ো কোন নবী ছিলেন না তো ? আবার তিনি বলেছেন- আওয়াজ শুনে বুড়োর বিবি ডাক দিয়ে বলে, স্বামী শুনেছেন কি ? ঐ আরশ থেকে কে জানি আওয়াজ দিল। আপনার নাম জাহান্নামে লিখা হয়ে গেছে (ঐপৃঃ৮৯) পাঠক বলুন আল্লাহর ডাক কি এত সস্তা যে বুড়ো ও বুড়োর বিবিও শুনতে পেয়েছে? চরমোনইএর মুরীদগণ বুড়োর বিবিকে নবী মানবেন না তো? কিন্তু ওলীপুরী ও কাশেমী চোখ বন্ধ করে এসব ভ্রান্ত আক্বীদা মেনে নেন কেন ?

শায়খুল হাদীস আজিজুল হক

ওহাদাতে অজুদ মতবাদের বিশ্বাসী দেওবন্দী ব্রেলভী ও শায়খুল হাদীস আজিজুল হক নিজেও। এ মতবাদের উৎগতা ইবনে আরাবী। ইবনে আরাবীর মতে, আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করেনা বরং আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেন। যা কিছু সুপ্ত বা অবক্ত অবস্থা আল্লাহর সত্তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তা ব্যক্ত হচ্ছে অথবা প্রকাশ লাভ করছে এবং তিনি মুর্তরুপ ধারণ করছে। ইবনে আরাবীর মতে গানিতিক সংখ্যা, এক গানিতিক বিন্দু,ও একটি চক্রের কেন্দ্র বিন্দুর উপমা, গানিতিক একের উপর যেমন গানিতিক অসংখ্য সংখ্যা দাড়িয়ে থাকে, তেমনি ভাবে একের উপর বহুত্ব দাড়িয়ে আছে। একই মূলত বহুর ভিত্তি। সুধু কি তাই? তার মতে আল্লাহ নারী রুপে পৃথিবীতে বিভিন্ন দফায় আসা যাওয়া করে। প্রথমে হাওয়া রুপে বাবা আদমের জন্য তার পর

কায়েস এর জন্য লুবনা রুপে জাম্যল নামক ব্যক্তির প্রেমিক বুদারহাহ রুপে আবার কুসাইয়ের নামক আশেকের জন্য আযযা রুপে। তিনি বলতেন, খোদা দর্শন ও খোদা ধ্যান নারী জাতি দিয়ে পূনাঙ্গ ভাবে লাভ হয়। খোদাকে তো আর এমনে দেখা যায়না, কোন বাস্তব ধাতব বস্তুর ভিতর ছাড়া। তাই নারীর লাবন্যতায় অবয়ব দৈহিক সৌন্দর্য হল খোদাকে বিভিন্ন ওয়াজুদ ও সত্তার ভিতর দর্শনের তৃপ্তির জন্য বড় উপকরণ।এমনকি নিজ কণ্যাও স্ত্রীর মধ্যেও কোন তারতম্য নেই। এ সবই এক বস্তু। এক কথায় সৃষ্টির সমস্ত বস্তুই হল খোদার অংশ। তাই স্রষ্টার সত্ত্বা ও সৃষ্টির সত্ত্বার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ওহা এক ও অভিন্ন। ইবনে আরাবী নিজেই বলেছেন আমিই ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিল, নিজের আলোকে তখন আমি নিজেই দর্শক ছিলাম। তখন কোন জগৎ ছিলনা। এই আদমের নাম নিশানাও ছিলনা। আমি শুধু নিজের রুপে নিজেই বিভোর হয়েছিলাম। শিরক কে ধ্বংস করে তাওহীদ প্রতিষ্টার জন্য আমি আম্বিয়া ও আউলিয়ার সুরতে নিজেকে প্রকাশ করি। আমি আদমের পুষাকে আবৃত ও লুক্কায়িত হয়ে আমি ফেরেশতাগণের সিজদা গ্রহণ করেছিলাম এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুরতে আমি বিভিন্ন সময়ে কখনো শীশ (আঃ) কখনো ইউনুস(আঃ) কখনো ইউসুফ (আঃ) কখনো ইয়াকুব (আঃ) আবার কখনো হুদ (আঃ) এর রূপে প্রকাশিত হয়েছি। বিস্ত ারিত জানার জন্য পড়ুন আমার লেখা "তাসাউফের মর্মকথা ও মারেফাতের ভেদ তত্ত্ব" পাঠক উপরোক্ত কথা গুলি স্পষ্ট কুফুরি এবং মুশরেকী ধ্যান ধারণায় ভরা। কিন্তু এই ভ্রান্ত সুফী ইবনে আরাবীর ইলহামকেই শায়খূল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক তার অনুদিত বুখারী শরীফে আল্লাহ পাকের বাণী বলে চালিয়ে দেয়। (বুখারী ৫ম খন্ড পৃঃ ২ অনুবাদক আজিজুল হক হামিদীয়া লাইব্রেরী) আজিজুল হক সাহেব তার অনুদিত বুখারীতে দীর্ঘ্য কবিতা লিখেছেন। উক্ত কবিতা রাসূল (সাঃ) এর রওজা মোবারকে বসে শিরকী ভাব ধারায় আজিজুল হক বলেন- আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম, তাহাকে ভিষন ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে.....ক্ষত বিক্ষত হৃদয় নিয়ে গুনাহ হইতে পলায়ন করিয়া আপনার দোয়ারে পৌছিয়াছি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন (আজিজুল হক অনুদিত বুখারী/পৃঃ ৪০৩)। পাঠক আজিজুল হক আল্লাহর গোলাম হওয়ার পরিবর্তে রাসূল (সাঃ) এর গোলাম হয়ে রাসূল (সাঃ) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কি শিকর নয় ? হানাফী মাযহাবের কিতাব দূর্রে মুখতারে বলা হয়েছে-"(اكره ان يقول احد في دعائه اللهم اني اسالك بحق خلقك) হে আল্লাহ আমি তোমার সৃষ্টির অধিকারের

অছিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, কেউ তার দোয়ার মধ্যে এমন কথা বলাকে আমি পছন্দ করি না। (দুর্রে মূখতার ২য় খন্ড ৬৩০ পৃঃ) হানাফী মাযহাবের কিতাবের ফতোয়া ওলীপুরী ও কাশেমীর ওস্তাদ আজিজুল হক মানেন না। এরাই আবার হানাফী মাযহাবের দাবীদার। আল্লাহ পাক বলেন- আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবেন না এবং তিনি ব্যাতীত আমি অপর কোন আশ্রয় স্থলও পাব না (জ্বীন- ২২,২৩) যেখানে আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত রাসূল (সাঃ) নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না সেখানে আজিজুল হক্ব কিভাবে রাসূল (সাঃ) এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আজিজুল হক্ব কি কুরআনের এ আয়াত পড়েন নাই ? আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যদি তাদেরকে (সুপারিশের জন্য) আহ্বান কর, তাহলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না। আর শুনলেও তারা তোমাদের ডাকের কোন জবাব দিবে না। (ফাতির-১৪, আহকাফ-৫) আবার ইবনে আরাবীর দাবি অনুসারে ইবনে আরাবীকে আজিজুল হক সাহেব আল্লাহ বা স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। আজিজুল হক সাহেবের ভক্তবৃন্দরা ইবনে আরাবীর ইলহামকে আল্লাহর বানী তথা কুরআনের আয়াত হিসেবে মানবেন কি ? এগুলো ভ্রান্ত কথা শুনা ও দেখার পরও ওলীপুরী ও কাশেমী তাদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র শব্দও করেননি। জানিনা ওলীপুরী ও কাশেমীর নীল চশমায় তা ধরা পড়েনা কেন ?

মাসিক মদীনার সম্পাদক মহিউদ্দিন খান

মাওঃ মহিউদ্দিন খান, মাওঃ আজিজুল হক ও অন্যান্য দেওবন্দী আলেমদের আক্বীদা হলো রাসূল (সাঃ) নূরের সৃষ্টি। আল্লাহর নূরে রাসূল সৃষ্টি আক্বীদার দেওবন্দি ও মাজহাবী সূফীরা, নূরি মুহাম্মাদীর পক্ষে কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পেশ করে থাকে। তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু জ্যোতি এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব- (সূরা মায়িদাহ- ১৫)। আয়াতের উল্ল্যেখিত নূরকে হিদায়েতের নূর তথা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, আবার কেউ কেউ এ নূর দ্বারা নবীকে বুঝিয়েছেন, নবীকে নূর সেই অর্থেই বলা হয়েছে যে অর্থে কিতাবকে নূর বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) নূরে হিদায়েত ছিলেন। তিনি ব্যাক্তি সত্ত্বা হিসাবে নূর ছিলেন না। সমস্ত নির্ভরযোগ্য তাফসীরে এরূপ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নূরে মুহাম্মাদীর দাবীদার কিছু সূফী সূরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াতকে তাদের

আবিস্কৃত নূরে মুহাম্মাদীর দলীল হিসাবে ব্যবহার করে বলে আসছে যে সকল নূরের মালিক আল্লাহ সেই আল্লাহ পাকের নূর হতে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নূর থেকে সকল কিছু সৃষ্টি হয়।তার পর তাঁর নূর হতে 'আরশও অন্তর বা রূহ সৃষ্টি করেন। এখানে সূফীগণ আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সৃষ্টি বা মাখলুককে শরীক করেছেন তা সুস্পষ্ট। অথচ উপরোক্ত আয়াত থেকে কোন ভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল (সাঃ) নূরের সৃষ্টি। কারণ নূর শব্দটি কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় বিবৃত হয়েছে। কখনো দ্বীন ইসলামকে নূর বলা হয়েছে, কখন কুরআনকেও নূর বলা হয়েছে, আবার কোথাও একই ভঙ্গিতে রাসূল (সাঃ)-কেও নূর বলা হয়েছে। এমনিভাবে কোন কোন আয়াত তাওরাত ও ইঞ্জিল আসমানী গ্রন্থকেও নূর বলা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। এখানে হিদায়েত কে নূর বলা হয়েছে আবার সূরা নিসার ১৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। এখানে কুরআনকে নূর বলা হয়েছে। সূরা আনয়ামের ৯১ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ মানুষের হিদায়েত ও আলোক বর্তিকারূপে যে কিতাব মূসা (আঃ) এনেছিল, এখানে তাওরাতকে নূর বলা হয়েছে। আবার কোন কবি আকাশের তারকাকে নূর বলেছেন- "ইয়া হাছনু হুমুল লায়লু হাদা জান্নুহুম ওয়া নুরু হুম এফুকু নুরাহু নাজমুন।" অর্থ হলঃ কি যে তাদের সৌন্দর্য রজনী তাদেরকে ঢেকে ফেলেছে। তাদের আলো তারকারাজীর আলোর (নূর) উপরে ছড়িয়ে আছে। অপর একজন কবি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এর প্রসংশায় বলেন- إذا سار عبد الله من مرو ليلة- فقد سار عنها نورها وجمالها-

অর্থ: আব্দুল্লাহ যখন কোন রাতে মারভ শহর থেকে চলে যায়। তখন এ শহর থেকে চলে যায় তার নূর ও রূপশ্রী। এখানে নূর দ্বারা নূরের তৈরী বুঝানো হয় নি। তারা কুরআন এর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-কে নূরের তৈরি প্রমাণ করতে ব্যার্থ হয়ে হাদীসের আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেছে। অথচ তাদের পেশ করা বর্ণনাগুলো মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর। এখানে শুধু মাত্র নূরে মুহাম্মাদীর পক্ষে তারা যে দলিল দেন একটি হাদীস পেশ করছি। আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্টি। (হাদীসটি জাল-মিশকাত হা ৯৪ টিকা) এরূপ আরো কতিপয় বর্ণিত হাদীস কে পুঁজি করে সূফীরা বলেন যে,

রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি। এ নূরী মুহাম্মাদী সূফীদের মধ্যে দু'ধরনের মত দেখা যায়, কোন কোন সুফীর মতে আল্লাহ পাকের জাতি নূর হতে রাসূল সৃষ্টি আবার কিছু সুফী ভিন্নমত পোষণ করে। আর তা হল, রাসূল (সাঃ) নূরে মুজাস্‌সাম দ্বারা সৃষ্টি। মুজাস্‌সাম এর অর্থ ও দুইভাবে করতে দেখা যায়, এক আল্লাহর জিসেম তথা আল্লাহর সত্তা বা শরীর হতে রাসূল সৃষ্টি আবার কারো মতে রাসূল (সাঃ) এর জিসেম মুবারক তথা তাঁর শরীর আলাদা নূর দিয়ে সৃষ্টি।~এদু'টি মত পোষণ কারী সূফীগণ একে অপরকে ভ্রান্ত মনে করে। আবার দ্বিতীয় মত পোষণ কারী সূফীগণ প্রথমোক্ত মতকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করছে যে, আল্লাহ হতে কিছু হয় না। হতে পারে না, এরূপ ধারণা করা শিরক, তাই প্রথমোক্ত সূফীগণ কাফের। কাজেই তাদের যুক্তি। উপরোক্ত হাদীস এর দৃষ্টিতে আল্লাহ আলাদা বা স্বতন্ত্র নূর দিয়েই তাঁর সত্তা তৈয়ার করেছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে, রাসূল (সাঃ) যদি আলাদা নূরে তৈরি হয়, তবে ফেরেশতারা কোন নূরের সৃষ্টি? যদি বলা হয় ফেরেশতাও আলাদা নূরের সৃষ্টি। তাহলে আরেক নতুন প্রশ্ন দোলা দেয়, তাহলে কি রাসূল ও ফেরেশতা এক ও অভিন্ন ? আমরা জানি ফেরেশতা নূরের তৈরি, সে জন্যই তাঁরা অদৃশ্য, আর রাসূল (সাঃ) মাটির তৈরি মানুষ তাই তিঁনি স্বীয় অবয়বে দৃশ্যমান। তাহলে রাসূল ফেরেশতা হল কিভাবে? অতএব দৈহিক ভাবে রাসূল (সাঃ) কে নূরের সৃষ্টি বলে দাবী করা শুধু আযৌক্তিকই নয় বরং চরম মূর্খতা। তিনি সৃষ্টির ব্যতিক্রম ধর্মী নবুয়তী নূরে উদ্ভাসিত। নবুয়তী নূরের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ বিভ্রান্তির কারণ। তাদের কেউ কেউ সর্ব প্রথমত আমার নূর কে সৃষ্টি করেছে হাদীসটির অর্থ করেছেন রাসূল (সাঃ) এর সত্তা বা শরীর নয় বরং তার আত্মা নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ অর্থে তো সকল বস্তুর মূলেই ছিল নূর। যেমনঃ রস=রজঃ বীর্য। রজঃ বীর্যের মুল শুক্রকীট, এর সুক্ষাবস্থাও নূর বা আলো। শুক শব্দের মূল ধাতু (শুচ+)র অর্থও আলো বা আলোর আভা। আবার পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ কোয়ার্ক এর আলোর ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে ফোটন কণা। পদার্থের কোয়ার্ককে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এমন এক অবস্থায় পরিণত হয় তখন আর পদার্থ পাওয়া যায় না। তখন শুধু পাওয়া যায় নুর আর নুর অর্থ্যাৎ আলো আর আলো । এ আলোই হচ্ছে রব এর ইচ্ছা বা হুকুমঃ (যখন তিনি ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাৎ যা হয় তাই সৃষ্টি) তিনি যখন বলেন (কুন) হও তখনি হয়ে যায়। এ অর্থে শুধু রাসূল (সাঃ)-ই নূর নয়, বরং সকল বস্তুই নূর এর সৃষ্টি। সুতরাং

রাসুল (সাঃ) এর ব্যক্তি সত্ত্বা নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কল্পনা করা চরম মূর্খতা।

আল্লাহ পাক বলেন, তাঁর নিদর্শনের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। পরে তোমরা সহসা বাশার তথা মানুষ হয়ে উঠবে, (যমীনে) ছড়িয়ে পরবে। (রুম ২০) স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে একজন বাশার (মানুষ) সৃষ্টি করবো (ছোয়াদ ৭১) অতঃপর স্মরণ করুন, সেই সময়কার ব্যাপার যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, পঁচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটির আঠা দিয়ে একটি বাশার (মানুষ) সৃষ্টি করছি (হিজর ২৮) রাসূল (সাঃ) বলেন, "প্রত্যেক শিশুর নাভিতে ঐ মাটির অংশ থাকে যা থেকে সে সৃষ্ট হয়েছে। এমন কি সেই মাটিতে সে কবরস্থ হবে। আমি, আবু বকর ও উমর একই মাটি হতে সৃষ্টি এবং সেখানেই কবরস্থ হব। (তাফসীরে মাযহারী, সূরা তা-হা) উপরোক্ত কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হল যে, রাসূল (সাঃ) মাটির তৈরি নূরের তৈরি নয়।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন: "আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন।" (কাহফ : ১১০) তাছাড়া মাটির তৈরী মানুষকেই আল্লাহ পাক ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এবং মাটির তৈরী মানুষকেই শ্রেষ্ঠ মাখলুক বলে ঘোষণা করেছেন। রাসূল (সাঃ) কে মাটির তৈরী না বলে নূরের তৈরী বললে ইবাদতের গন্ডির ভিতরে থাকে না এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ঠিক থাকে না। কাজেই রাসূল (সাঃ) মাটির তৈরী মানূষ না বলে উপায় নেই। মাওলানা মহিউদ্দিন খান তার অনুবাদ গ্রন্থ "সাওয়্যাহেদুন নবুয়্যাত" ২৭২ পৃষ্ঠায় বলেন- খলিফা মামুনুর রশিদের ইন্তিকাল হলে ইমাম মুহাম্মদ (জন্ম ১৯৫ হিঃ) বললেন, আমার মৃত্যু আজ থেকে ৩০ মাস পার হবে বাস্তবে তাই হয়েছিল। পাঠক এটা সকলেরই জানা গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন (সূরা নমল-৬৫)। কোন কোন ক্ষেত্রে গায়েবের খবর নবীকে জানিয়েছেন আল্লাহ নিজে। (সূরা হুদ-৪৯) তাহলে ইমাম মুহাম্মদ কীভাবে জানলেন তার মৃত্যুর আগাম সংবাদ ? ইমাম মুহম্মাদ নবী ছিলেননা তো ? মহিউদ্দিন খানের ফাতোয়া অনুযায়ী ইমাম মুহাম্মদকে আলিমুল গায়েব মনে

করা যাবেতো ? এখানে ওলীপুরী সাহেব কি বলবেন ? আপনার ফতোয়া কি মহিউদ্দিন খানের জন্য প্রযোজ্য হবে ?

৬ নং অভিযোগ ঃ ওলীপুরী বলেন দেড়হাজার বছেরের ইসলাম আইন শাস্ত্রবিদগণ যেখানে টাইকে ইসলামী পোশাক বলেননি, সেখানে একবিংশ শতাব্দীর কুরআন শিক্ষায় অজ্ঞ ডাঃ জাকির নায়েক এটাকে ইসলামী পোশাক সাবস্থ করার অভিযান চালাচ্ছেন। (জাকির নায়েকের আসল চেহারা পৃঃ০৯) ওলীপুরীর এই অভিযোগটি একেবারেই মিথ্যা। জাকির নায়েক টাই পরাকে ইসলামী পোশাক কোথাও বলেননি। তিনি যা বলেছেন- আমি পশ্চিমা দেশে যাই তাই টাই পড়ি। ইসলামে টাই পরা যাবে না তা প্রমাণ হয়না। এখানে তো এমন কথা বলা হয় নাই যে, টাই ইসসলামী পোশাক ? যাদের দৃষ্টিতে টাই যীশুখ্রীষ্টের ক্রশের চিহ্নের মত। তাই টাই পড়া মুসলিমদের জন্য হারাম। উক্ত সূত্র অনুযায়ী হিন্দুদের দেওয়া সাইট কাটা পাঞ্জাবী পরাওতো হারাম। কেননা সম্রাট আকবরের সময় হিন্দুদের থেকে আবিস্কৃত এ পাঞ্জাবী। (সূত্র মাসিক আল-বাইয়্যনাত) এ পাঞ্জাবী আরব দেশে পরা হয় না। পরা হয় না হিন্দুদের দেওয়া শাড়ি। তাহালে তো পাঞ্জাবী শাড়ি সবই পরা হারাম। অথচ মুশরেক দের চেয়ে খ্রীষ্টানদের ধর্ম মুসলিমদের নিকটবর্তী। তাছাড়া টাই যদি খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় পোশাক হতো তবে খ্রিষ্টান ধর্ম জাজকদেরকে তা পরতে দেখা যেত। কিন্তু খ্রিষ্টান পাদ্রীরা তা পরে না। অতএব উক্ত টাই বিধর্মীদের বিশেষ কোন পেশাক নয়। এটা সকলেরই বোধগম্য।

৭ নং অভিযোগ ঃ ওলীপুরী বলেছেন- জাকির নায়েক বিশুদ্ধ তিলওয়াত করতে পারেন না।জন্মগত ভাবে কিংবা মুখের জড়তা থাকার কারণে কারো তেলওয়াত বিশুদ্ধ না হয় সেটা দোষের কিছু নয়। যেমন হযরত মুসা (আঃ) ও বেলাল (রাঃ) এর মত মহান ব্যাক্তিদের মাঝেও এ জড়তা ছিল। যার ফলে তাদের তেলওয়াত আটকে যেত। তাতে কোন দোষ হয়নি। তার নিজের মুখের জড়তা থাকার "ডিয়ার টু আসক" শীর্ষক আলোচনা স্বীকার করেছেন। জাকির নায়েকের তার নিজের মুখের জড়তা থাকার কারণে তেলওয়াত বিশুদ্ধ না হলে, তাতে দোষ কি ? জাকির নায়েক কুরআন বিশুদ্ধ ভাবে তিলাওয়াত করেতে না পারলেও সেখানের ছেলে মেয়েদেরকে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত

শিখানোর ব্যবস্থা করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে সে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের পক্ষে। তাছাড়া তিনি তো কোন আলেম, মুহাদ্দিস, মুফতি ক্বারী এসব পরিচয় দেন না। ওলীপুরী ও কাশেমীর মত তিনি কোথাও ইমামতিও করেন না। তিনি শুধু ঐ কাজটিই করে যাচ্ছেন রাসূল (সাঃ) এর বাণী بلغوا عني ولو اية আমা থেকে একটা বাক্য হলেও তা প্রচার করো। (বুখারী) এখানে কিন্তু রাসূল (সাঃ) তাঁর বাণী পৌছানোর জন্য কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শর্ত করেন নি।

মুফতী কাশেমীর লেখা ডাঃ জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ নামক বইয়ে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ খন্ডন

কুকুর জাতির মধ্যে মারাত্মক কুকুর হলে পাগলা কুকুর। যে কুকুরে কামড় দিলে শরীরে বিষ সঞ্চালিত হয়ে মস্তিষ্কের বিকৃত ঘটায় ফলে জলাতঙ্কর মত মারাত্মক রোগ পেয়ে বসে সাথে সাথে রোগী মানুষিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করে। তখন বিশুদ্ধ পানি দেখেও রোগী ভয় পায়। অনুরুপ বিদ'আতী আলেম বিদ'আতী কর্যকলাপের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঈমানের বিকৃত ঘটে তখন বিশুদ্ধ তাওহীদ ও বিশুদ্ধ তাওহীদ বাদী দাঈকে দেখে জলাতঙ্ক রোগীর মতই ভয় পেতে শুরু করে। তারই বহিঃপ্রকাশ জাকির নায়েকের ভ্রান্ত নামক গ্রন্থ খানি। উক্ত গ্রন্থে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তা আমার পর্যায়ক্রমে খন্ডন করবো ইনশাআল্লাহ।

১ নং অভিযোগ ঃ মুফতি কাশেমী সাহেব অভিযোগ করেছেন ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন তারাবীর নামায বিশরাকাত এর কোন প্রমাণ নেই। জাকির নায়েক ঠিকই বলেছেন। মুফতী কাশেমীর জানা ছিল না যে, তারাবীর নামায আট রাকাত একথা শুধু জাকির নায়েক একাই বলেন নাই হানাফী জগতের বাঘা বাঘা মুহাদ্দিসগনও বলেছেন। এবং হানাফীদের বড় বড় কিতাবে বলা হয়েছে তারাবীর নামায আট রাকাত বিশ রাকাত এর সহীহ কোন প্রমাণ নেই। মুফতী কাশেমী তার লেখা "কুরআন হাদীসের আলোকে হানাফীদের আমলের সুদৃঢ় দলিল প্রমাণ" গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় বিশ রাকাতের পক্ষে ইবনে আবু শায়বা আল মুসান্নাফ ২য় খন্ড ৩৯৪ পৃষ্টার বরাত দিয়ে একটি মিথ্যা হাদীস উল্লেখ করেছেন। অথচ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে বর্ণিত ২০ রাকাত এর হাদীসটি জাল। কারণ ইবনে আব্বাসের নামে এই হাদীসটি তৈরি

করেছেন ইব্রাহিম ইবনে ওসমান ইবনে শায়বা এই লোকটি মিথ্যাবাদী ইমাম শুবা ইমাম নাসাঈ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। মিযানুল ইতিদাল ১ম খন্ড ৪৭/৪৮)

মুফতী সাহেব উক্ত গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় আর একটি হাদীস এনেছেন ইয়াযীদ বিন রুমান বলেন, উমার (রাঃ) এর সময় লোকেরা রামাযানে ২৩ রাকাআত নামায পড়তো। (বায়হাকী ২য় খন্ড ৪৯৬ পৃঃ) ইমাম বায়হাকী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এমনকি হানাফী বিদ্বানগনও হাদীসটিকে যঈক বলেছেন। যেমন-ইমাম যায়লায়ী' হানাফী এবং আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী বলেন ইয়াযীদ বিন রুমান উমর (রাঃ) এর সময়ে জন্ম গ্রহন করেনি। অতএব, সে কি করে বিশ রাকাআত তারাবীহ দেখলো ? (দেখুন-নাসবুর রা'য়াহ ২য় খন্ড ১৫৪ পৃঃ, উমদাতুল কারী ৫ম খন্ড ৩০৭ পৃঃ।) এই হাদীসটি উমর (রাঃ) এর নামে তৈরী করা হয়েছে। তিনি কখনও বিশ রাকাআত তারাবীহর নির্দেশ দেননি। তিনি বিতত্মসহ এগার রাকাআতের নির্দেশ দিয়েছেন। (মিশকাত ২য় খন্ড , হাদীস নং-১২২৮) এভাবে বিদআ'তিরা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে রাসূল (সাঃ) এর সহীহ হাদীস থেকে দূরে সরানোর জন্য অসংখ্য হাদীস তৈরি করে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবীদের নামে চালিয়ে দিয়েছে। হাদীসের দুশমনদের এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। তাই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত সর্বজন স্বীকৃতি হাদীসের বিপরীত ২০ রাকাআত তারাবীহর পক্ষে ভুয়া দলীল দেখে কোন সচেতন মুসলিম বিভ্রান্ত হতে পারেন না। অনেকে বলেন বেশি নামায পড়লে দোষ কী ? এর উত্তর বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে নিন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেন- তোমরা জেনে রাখ, (হাশরের দিন) আমার উম্মাতের কতগুলো লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ দোজখের দিকে নেয়া হবে। আমি তখন বলবো, প্রভু হে ! এরা তো আমার গুটি কয়েক সাহাবী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা দ্বীনের ভিতর কি নতুন আবিষ্কার করেছে তা আপনি জানেন না। রাসূল (সাঃ) বলেন, এর পর পূণ্যবান বান্দা যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলবো। হে আল্লাহ! যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক। (বুখারী আরবী দ্বিতীয়

খন্ড ৬৬৫ পৃঃ, কিতবুত তাফসীর সূরা মায়িদা) এই হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু বৃদ্ধি করলে আল্লাহ পাক সাহাবীদেরকেও ছাড়বেন না। অতএব, আল্লাহর নবী (সঃ) যেহেতু কোনদিন বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েননি তাই বিশ রাকাআত তারাবীহ বিদআত এবং বিদআতের পরিনাম জাহান্নাম। তারাবীর নামায আট রাকাত তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) রামাযানে কিংবা অন্যান্য মাসে বিত্‌র সহ এগার রাকআতের বেশি পড়তেন না। (বুখারী তৃতীয় খন্ড তারাবীহ অধ্যায় হাঃ-১৮৮১ ইং ফাঃ, মুসলিম তৃতীয় খন্ড ৬৪ পৃঃ হাঃ নং- ১৫৯৩ ইঃফাঃ)। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রামযান মাসে তাঁর ঘরে মহিলাদেরকে নিয়ে আট রাকাআত তারাবীহ এবং বিত্‌র পড়লেন। (দেখুন-সহীহ ইবনে হিব্বান ও সহীহ ইবনে খুয়ায়মার বরাতে নাসবুর রায়াহ ১ম খন্ড ২৭৬ পৃঃ)। উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, তিনি বলেন রাসূল (সঃ) সাহাবীগণকে রামাযানে আট রাকাআত তারাবীহ নামায পড়লেন। রাসূল (সঃ) ইহা শ্রবন করে সম্মতিসূচক মৌনতাবলম্বন করলেন। (দেখুন কিয়ামুল লাইল ৯০পৃঃ)। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রামযান মাসে আমাদের নিয়ে আট রাকআত তারাবীহ পড়লেন। অতঃপর বিত্‌র পড়লেন। (দেখুন-কিয়ামুল লাইল ৯০ পৃঃ তাবারানী সগীর ১০৮ পৃঃ, সালাতুত তারাবীহ-আলবানী ১৮ পৃঃ)। সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) উবাই বিন কা'আব ও তামীম আদ্দারীকে এগার রাকআত (বিত্‌রসহ) তারাবীহ-র নামায পড়াবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। (মোয়াত্তা মালেক-৪০পৃঃ। মিশকাত, আলিম ক্লাসের পাঠ্য আরাফাত প্রকাশনী ২য় খন্ড তারাবীহ অধ্যায়-হাঃনং-১২২৮)। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) রাতে তের রাকাআত সালাত আদায় করতেন। প্রথম আট রাকআত সালাত আদায় করতেন। অতপর বিত্‌র পড়তেন। (মুসলিম তৃতীয় খন্ড হাঃ নং-১৫৯৪ ইঃ ফাঃ)। নোটঃ এই হাদীস দ্বারা প্রমান হয় যে, রাসূল (সঃ) তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ আট রাকআত পড়তেন। তার পর বিতর পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রামাযান ও অন্যান্য মাসে রাসূল (সঃ) এর রাতের নামায ছিল তের রাকআত। এর ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ও রয়েছে। (মুসলিম, হাঃ/-

১৫৯৬ ইঃ ফাঃ) এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত বাদে রাসূল বিতরসহ ১১ রাকআত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিন রাকআত বিতর আট রাকআত তারাবীহ। নবী (সঃ) এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এশার সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর হতে ফজর পর্যন্ত সময়ের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম তৃতীয় খন্ড হাঃ নং-১৫৮৮ইঃ ফাঃ)। উল্লেখ্য যে, তাহাজ্জুদ শব্দটি আরবী (হুজদুন) শব্দ থেকে উৎপত্তি , যার অর্থ হল, রাতে ঘুম থেকে জাগা। তাই কোন ব্যাক্তি যদি উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নামাযটি রাতে ঘুম থেকে জেগে আদায় করে তখন তাকে সালাতুল তাহাজ্জুদ বলে। (দেখুনঃ আলমুনজীদ-১১১৫ পৃঃ) আর কেহ যদি উপরে বর্ণিত সালাতটি রমযান মাসে প্রথম রাতে পড়ে তখন তাকে সালাতুত তারাবীহ বলে। মনে রাখবেন, আল্লাহর নবী একই রাতে দুটি নামায পড়েননি অর্থাৎ প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়েননি। কারণ উহা একই নামাজের দু'টি নাম মাত্র। এ ব্যাপারে হানাফী জগতের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন-আমার নিকট এ দুটি নামায একই নামায। সাধারণ লোকেরা এটার অর্থ ও মর্ম না বুঝে দুটো আলাদা নামায বানিয়ে দিয়েছে, (দেখুন-ফয়জুল বারী সরহে বোখারী, ২য় খন্ড ৪২০ পৃষ্ঠা।) হানাফী ভাইয়েরা, বায়হাকী , তাবারানী ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়েন। এ হাদীস সম্পর্কে হানাফী ফেকহের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হেদায়ার ব্যাখ্যা লেখক আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, উক্ত হাদীসটি দুর্বল এবং বোখারী-মুসলিমে বর্ণিত সঠিক ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী (ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, ২০৫ পৃঃ) হেদায়াতর বর্ণিত হাদীস সমূহের ভুলত্রুটি যাচাইকারী হানাফী পন্ডিত আল্লামা যায়লায়ী বলেন, বিশ রাকআতের হাদীসটি যঈফ হবার সাথে সাথে আয়েশা বর্ণিত সহীহ হাদীসের (এগার রাকআতের) বিরোধী (নাসবুর রায়াহ, ২য় খন্ড, ১৫ পৃঃ)। আল্লামা তাহ্তাভী ও আল্লামা আবুস্সউদ হানাফী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বিশ রাকআত পড়েননি, বরং আট রাকআত পড়েছেন (তাহ্তাভী হাশিয়া দুররে মোখতার ১ম খন্ড, ২১৬ পৃঃ মিসরী ছাপা এবং ফতহুল মুয়ীন শারহে কানয, ২৬৫ পৃঃ, মিসরী

ছাপা হামাভীর আলআশবাহ অন্‌নাযা-য়েরের বরাতসহ)। আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী হানাফী বলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে বিশ রাকআত প্রমাণিত নেই। যেমন তা বাজারে প্রচলিত। কিন্তু ইবনে আবী শায়বার রেওয়ায়াতে যে বিশ রাকআত আছে তা যঈফ এবং সহীহ হাদীসের বিপরীত (ফাতেহা সিররিল মান্নান লিতা য়ীদে মাযাহাবিন নো'মান, ৩২৭পৃঃ)। আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, আট রাকআতের সুন্নত হওয়াটা দলীল মোতাবেক (রদ্দে মোহতার হাশিয়া দুররে মোখতার ১ম খন্ড, ৬৬০পৃঃ) বাহরুর রা-য়েক ২য় খন্ড ৭২ পৃষ্ঠায়ও আছে যে, তারাবীহ আট রাকআত সুন্নত। দেওবন্দী হানাফী আলেমদের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিদ্বান আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন, তের রাকআতের বেশী তারবীর নামায প্রমাণিত নেই, তবে একটি দুর্বল হাদীস ছাড়া (ফায়যুল বারী, ২য়খন্ড, ৪২০পৃঃ)। আল্লামা আইনী হানাফী বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, যে বর্ণনাগুলোতে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর তারাবীহ পড়ানোর বর্ণনা আছে, তাতে তো রাকআতের উল্লেখ্য নেই? আমি বলবো, ইবনে খুযায়মাহ ও ইবনে হিব্বান জাবের (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে রমযানে আট রাকআত নামায পড়ান (উমদাতুল কা-রী ৭ম খন্ড, ১৭৭ পৃঃ, মুনীরিয়্যাহ ছাপা) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী হানাফী বলেন, একথা না মানার কোন উপায়ই নেই যে, নবী (সাঃ) এর তারাবীহ আট রাকআত ছিল। (আল আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃষ্ঠা) হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, হানাফী শায়খদের কথা দ্বারা বিশ রাকআত তারাবীহ বোঝা যায়। কিন্তু দলীলের তাগিদ, বিতরসহ এগার রাকআত তারাবীহ ঠিক (মেরকাত ১ম খন্ড, ১৭৫পৃঃ) হানাফী ফেক্‌হ নুরুল ঈযাহের ব্যাখ্যাকারী বলেন, ইবনে আবী শায়বা, তাবারানী ও বায়হাকীতে ইবনে আব্বাস বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিশ রাকআত পড়া হাদীসটি যয়ীফ (মারাকিল্ ফালাহ-২২৪ পৃঃ) এই গ্রন্থের টীকাকার আল্লামা তাহতাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বিত্‌র সহ মাত্র এগার রাকআত তারাবীহ প্রমাণিত আছে (ঐ পৃষ্ঠায় ৮নং টীকা) দেখলেন তো হানাফীদের বড় বড় আলেম আট রাকাতের পক্ষে কিভাবে ফতোয়া দিলেন ? তাহলে জাকির নায়েক বললে এত ব্যাথা কেন? জানিনা কাশেমী ও ওলীপুরীরা কোন হানাফী মাযহাবের

অনুসারী। তা না হলে উপরোক্ত হানাফী আলেমদেরকে উপেক্ষা করে বলতে পারে যে, তারাবীর নামায বিশ রাকাত ? আবার, বুখারী শরীফের টীকাকার ঃ মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী বলেন, বিত্‌র সহ রমাযানের কিয়াম (তারাবীহ) এগার রাকআত জামআত সহকারে। নবী (সাঃ) তা করেছিলেন (বুখারী ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩নং টীকা)। নিম্নলিখিত হানাফী গ্রন্থসমূহে ও মন্তব্য করা হয়েছে যে, বিশ রাকআতের হাদীস দুর্বল ও আমলের অযোগ্য (আবু তাইয়েব মহোম্মাদ ইবনে আবুল কাদের সিন্ধি হানাফীকৃত শারহে তিরমীযি ১ম খন্ড ৪২৩ পৃষ্ঠা। আল্লামা মোহাম্মদ তাহের হানাফীর মাজমাউল বিহার ২য় খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, শায়খ মোহাম্মাদ থানভী হানাফীর হাশিয়া নাসায়ী ১ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা। মুফতী আযীযুর রহমানের ফাতাওয়া দা'রুল উলুম দেওবন্দ ২য় খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা। বিশ রাকআত তারাবীহের প্রমাণে বর্ণিত হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবু শায়বা ইবারাহিম ইবনে উসমানকে দুর্বল ও বিভিন্ন দোষে দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করা হয়েছে নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থ সমূহে।

ইমাম নবভীর শারহে মুসলিম ১৭ পৃষ্ঠা। হাফেয ইবনে হাজারের তাহযীবুত তাহ্‌যীব ১ম খন্ড ১৪৪ পৃঃ। আদ দিরায়াহ ১২৩ পৃষ্ঠা। ফাতহুর বারী ৪র্থ খন্ড, ১৫৮ প্রষ্ঠা। ইবনে হাজার হয়সামীর আলফাতা-ওয়াল কুবরা ১ম খন্ড ১৯৫ পৃষ্ঠা। আল্লামা সুয়ুতীর তানভীরুল হাওয়ালিক ১ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। মুআত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ শারহে যুরকানী ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। সুবুলুস সালাম ২য় খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা। ইমাম শওকানীর নায়লুল আওতা'র ৩য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।হানাফী ফেকহ কানযুদ দাকায়িকএর টীকাকার মাওলানা মোহাম্মাদ আহসান নানুতবী বলেন, নবী (সাঃ) বিশ রাকআত তারাবীহ পড়েননি। বরং আট রাকআত পরেছেন (হাশিয়া কান্‌যুদ দাকায়িক ৩৬ পৃষ্ঠা) ওলীপূরী ও কাশেমী সাহেবদের দেওবন্দী আলেম তথা তাদের গুরুজনের ফতোয়া নিম্নে দেয়া হলোঃ-

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী বলেন, এগার রাকআত সরওয়ারে দোআলম (সাঃ) এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত, যা বিশ রাকআতের তুলনায় জোরদার (ফুয়ূযে কাসিমিয়্যাহ, ১৮ পৃঃ)। তাবলীগ জামআতের বিশিষ্ট আলেম মওলানা যাকারিয়া বলেন, বিশ রাকআত তারাবীহ নির্দিষ্টরূপে নবী (সাঃ) থেকে মরফুভাবে মোহাদ্দেসীনে কেরামের তরীকা অনুযায়ী প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। (আওজাযুল

মাসা-লেক শারহে মোয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ৩৯৭ পৃঃ)। দেখলেনতো ? ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেবদের গুরুজনরা তারাবীর নামায আট রাকাত হওয়ার ফতোয়া দিলেন কিভাবে ? কাশেমী ও ওলীপুরী তাদের গুরুজনের ফতোয়াও মানেন না। এই হলো তাদের গুরুভক্তির নমুনা। গুরুদের ভাল কথা তারা মানতে রাজি নন। ভ্রান্ত আক্বীদার কথাগুলো ঠিকই মানেন। সুতরাং উক্ত আলোচনার দ্বারা এটা প্রমাণিত হল যে, বোখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী রমাযান ও গায়ের রমাযানে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায ১১ রাকআতই সঠিক-বিশ রাকআত প্রমাণিত নয়। মুফতী কাশেমী "ডাঃ জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ" নামক গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় বলেন, রাসূল (সাঃ) স্বায়ং এবং সাহাবায়ে কেরাম যে বিশ রাকাত তারাবী আদায় করেছেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান এবং আজও মক্কা মদীনা সহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এই ধারা চালু রয়েছে। মক্কা মদীনার দোহাই কখন মুফতী কাশেমীর লেখায় শোভা পায় না। কারণ মক্কা মদীনায় নামাযে রফউলদাইন করা হয়। ওলীপুরি/ মুফতী কাশেমী ও মাযহাবী ভাইরা কিন্তু তা করে না। মক্কা মদীনায় আমীন জোরে বলা হয়, একামতের বাক্য গুলো এবার করে বলা হয়, জানাজা নামাযে সুরা ফাতিহা পড়া হয়, বুকের উপর হাত বাধা হয় ইত্যাদি কিন্তু মাযহাবী ভাইয়েরা তা করে না। মক্কা মদীনার সাথে যাঁদের হাজারও মাসআলার ব্যতিক্রম তাদের লেখায় মক্কা মদীনার কথা কেমন করে শোভা পায় ? মক্কা মদীনাকে অনুস্বরণের কথা কুরআন সুন্নায় আছে কি ? অথচ যে মক্কায় ৮০১ হিঃ থেকে শুরু করে ১৩৪৩ হিজরী পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪২ বৎসর ধরে মক্কার মাসজিদুল হারামে এক নামায চার জামাআতে আদায় করার বিদাআত যদি এতদিন চলতে পারে। তবে তারাবীর ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের বিপরীতে আমল চালু থাকা বিচিত্র কিছু নয়। আজ থেকে ৬৯ বৎসর পূর্বে যেমন চার জামাআত উঠে গেছে, ২০ রাকাত তারাবীও একদিন উঠবেই ইনশাআল্লাহ। (বুখারী, সপ্তম অধ্যায় পৃঃ ৩৪১ টীকা, তাওহীদ প্রকাশনা)

মুফতী কাসেমী বলেছেন রফউল ইয়াদাইনের ফযিলত সর্ম্পকে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। (হানাফীদের আমলের সুর্দীঢ় দলিল পৃঃ ৩৮) মুফতি সাহেবকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সাহাবী উকবা বিন আমির জুহানী বলেন- রূকুর সময় এবং রূকু হতে ওঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করার প্রত্যেক বার এর জন্য ১০ টি করে নেকী রয়েছে। (আব্দুল্লাহ বিন আহমাদের মাসায়েলে আহম্মদ ৭০ পৃঃ কানযুল উম্মান ৭ম খন্ড ৩৩৯ পৃঃ) মুফতি সাহেব রফউল ইয়াদাইন

এর ফযিলতের হাদীস খুঁজে পায় না। এতদ্বতীত রূকুতে যাওয়া এবং রূকু হতে ওঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করা সর্ম্পকে চার খলিফাসহ প্রায় ৫০ জন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে আশারায়ে মুবাশ্শারগণ রয়েছে। (ফিকহুসুন্নাহ ১/১০৭ ফাৎহুল বারী ২/২৫৮) এবং সর্বোমোট সহীহ হাদীস ও আসারের সংখ্যা নুন্যতম চারশত (মাযযুদ্দিন, ফিরোযাবাদী, সিফরূস সাআদাত ফার্সী থেকে উর্দূ পৃঃ ১৫ বরাতে সালাতুর রাসূল সাঃ পৃঃ ৬৫ ড. গালিব) ইমাম সুয়ূতী রফউল ইয়াদাইন এর হাদীসকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন (তুহফাতুল আহওয়াবী ২ / ১০০, ১০৬) মুফতী কাশেমী ও ওলীপুরী সহীহ হাদীস মানেন না। অথচ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব। অন্যদিকে কাশেমী ও ওলীপুরী বুখারীর হাদীসও মানেন না। অথচ হানাফীদের সব চেয়ে বড় আলেম আল্লামা শাহরানপুরী বুখারী শরীফের ভূমিকায় বলেন-

واجمعت الا مة علي صحه هذين الكتا بين ووجو ب ا لعمل با حا د يثهما

বুখারী মুসলিমের হাদীস সহীহ এবং ওয়াজিবুল আমল হওয়াতে সমস্ত উম্মতের ইজমা হয়েছে (আরবী বুখারী ভূমিকা পৃঃ ৪)। জানিনা ওলীপুরী ও কাশেমী কোন শ্রেণীর হানাফী। শিয়া শ্রেণী হানাফী না সূফী শ্রেণী হানাফী ? কেননা শিয়ারা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসকে সহীহ মনে করে না। কাশেমী সাহেবের অবস্থও তাই। বুখারীর বর্ণিত তারাবীর নামায আট রাকাত, রফউল ইয়াদাইন করা সহীহ হদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কাশেমী ও ওলীপুরী সাহেব তা মানেন না। অথচ সকল মুহাদ্দীসের সর্বসম্মত মতে সমস্ত হাদীদ গ্রন্থের মধ্যে হতে বুখারীর মর্যাদা সবার উপরে এবং কুরআনের পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। اصح الكتب بعد كتاب الله حت اديم السما ء كتاب ا لبخاري

অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের পরে আসমানের নিচে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে বুখারী। অতএব প্রমাণিত হল- বুখরীরর বর্ণিত তারাবীর নামাজ আট রাকাত, নামাজে একাধিক রফউল ইয়াদাইন করা হাদীস গুলি সহীহ্ পক্ষন্তরে ওলীপরী ও কাশেমীর তারাবীর নামাজ বিশ রাকাত ও রফউল ইয়াদাইন না করার দলীল গুলি একেবারেই নড়বড় তা প্রমাণিত হলো।

২ নং অভিযোগ- মুফতী কাশেমী সাহেব তার গ্রন্থে বলেছেন জাকির নায়েক বলেছেন- রাসূল (সাঃ) একাধিক বিবাহ ছিল রাজনৈতি ফায়দা হাসিলের জন্য। তার জবাব নিন্মে দেওয়া হলোঃ-বিশেষ দূত হিসেবে মিশরের মকুকসের দরবারে রাসূলে করীম (সাঃ) জনৈক সাহাবীকে পাঠালেন একটা

চিঠি সহকারে। দূতের মাধ্যমে রাজা মকুকস মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হলেন। অবশেষে মিশরের রাজা নিশ্চিতভাবে আস্থাবান হলেন যে, প্রকৃত পক্ষে মদীনার এই মহাপুরুষই হলেন আখেরী নবী। প্রিয় নবী (সাঃ) এর প্রেরিত চিঠিতে শ্রদ্ধা ভরে চুমু খেলেন। বিশ্ব নবী (ছঃ) এর দুতকে জানালেন, "যদি আমি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিঃ প্রজারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করবে।" নবী করীম (সাঃ) এর দূতের হাতে একখানা চিঠি, কিছু দিনার, মধু, আতর, মেশক ইত্যাদি হাদিয়া পাঠালেন এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উপঢৌকন স্বরূপ মহানবী (সাঃ) এর সম্মানে আরো পাঠালেন মারীয়া ক্বিবতীয়া এবং শিরীন নামের দুজন অতি সুন্দরী মহিলাকে। সেই ছাহাবী এসব কিছু সঙ্গে নিয়েই মদীনা মুনাওয়ারা পৌছলেন। বিস্তারীত অবগত হয়ে আল্লাহর রসূল (সাঃ) ও মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হলেন। মিশরের মহারাজা মকুকসয়ের প্রদত্ত সকল উপহার উপঢৌকন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সানন্দে কবুল করলেন। কিন্তু মারীয়া ও শিরীন বোনদ্বয়কে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মসজিদে নবী (সাঃ) এর অদূরে সকল নিরাপত্তা সহকারে উভয়ের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করলেন। রাজা মকুকসয়ের দরবারে উহাদের ফেরত পাঠানো, ভদ্রতা, সামাজিকতা এবং প্রচলিত রীতিনীতির পরিপন্থী ছিল। তাই আসহাবে কেরামের পরামর্শ অনুসারে কয়েকদিনের মধ্যেই শিরীনকে জনৈক ছাহাবীর সাথে বিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত মারীয়া (রাঃ) বললেন ঃ মহানবী (সাঃ) চরণ তলে জীবন উৎস্বর্গ করে ধন্য হতে চাই । অন্যথায় আমাকে আমার নিজ মাতৃভূমিতে ফেরৎ পাঠানো হোক।" এহেন ঘোষনার পর মহানবী (ছঃ) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ "আমার একাধিক স্ত্রী রয়েছে, অনেক বয়সও হয়েছে, সেবিকা বা স্ত্রী কোনটাই তো প্রয়োজন নাই। " এ ব্যাপরে নিয়ে বিজ্ঞ আসহাবে কেরাম বিশেষ পরামর্শ সভায় বসলেন। সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলঃ কোন অবস্থায় মারিয়াকে মিশরে ফেরত পাঠান যাবে না। কারণ ইহা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অকল্যানকর হবে। মিশরের মহারাজা মুকুকস নিজেকে চরমভাবে অপমাণিত বোধ করবেন। তাই বিজ্ঞ এবং দূরদর্শী সাহাবা বৃন্দ মহানবী (সাঃ) এর দরবারে তাঁদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সহ আকুল আবেদন পেশ করলেনঃ যে কোন রকমে হযরত মারিয়া (রাঃ) কে বরন করে নিতে হবে। অবশেষে ইসলামের বিশেষ কল্যানের প্রেক্ষাপটে এহেন পবিত্র পরামর্শকে মহানবী (সাঃ) মেনে নিলেন। অর্থাৎ

সাইয়্যেদা মারিয়া ক্বিবতীয়া (রাঃ) কে বরন করে নিলেন। উল্লেখ্য-তারঁই গর্ভে নবী করীম (সঃ) এর শেষ সন্তান হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) জন্ম লাভ করেন।

ঠিক এমনি ভাবেই আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) জীবনের শেষ ভাগেই কখনও ধর্মীয় তায়ালীম বা শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য, কখনও প্রচলিত কু-সংস্কার উচ্ছেদের প্রয়োজনে, কখনও সামাজিক আবার কখনও রাজনৈতিক বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায়ে বহু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতএব জাকির নায়েকের কথাই সাঠিক প্রমাণিত হলো।

৩ নং অভিযোগ ঃ মুফতী কাশেমী সাহেব জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন জাকির নায়েক মুয়াবীয়া (রাঃ) এর ছেলে ইয়াযিদকে (রঃ) বলেন কেন ? তার জবাব নিম্নে দেওয়া হলোঃ-

ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়াহ-র চরিত্র সম্পর্কে হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও শী'আদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফী ইয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আমি তাঁর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তোমরা বলছ। অথচ আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও অবস্থান করেছি এবং তাঁকে নিয়মিতভাবে ছালাতে অভ্যস্ত ও কল্যাণের আকাংখা দেখেছি। তিনি 'ফিক্বহ' বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি সুন্নাতের পাবন্দ'। সমুদ্র অভিযান এবং রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, আমার' উম্মতের ১ম সেনাবাহিনী যারা সমুদ্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে, তারা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিবে'। অতঃপর তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের ১ম সেনাবাহীনি যারা রোমকদের রাজধানীতে অভিযান করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। মুহাল্লাব বলেন, এই হাদীসের মধ্যে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও তার পুত্র ইয়াযিদ-এর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হযরত ওসমান (রাঃ) -এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) সিরিয়ার গর্ভণর থাকাকালীন সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরী সনে রোমকদের বিরুদ্ধে ১ম সমুদ্র অভিযান করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত কালে (৪১-৬০ হিঃ) ৫১ হিজরী মতান্তরে ৪৯ হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্য ১ম যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়। উপরোক্ত

দলিলের ভিত্তিতেই ইয়াযিদকে (রঃ) বললে দোষের কিছু না। এটা মুফতী কাশেমী সাহেব জানেন না।

৪নং অভিযোগ ঃ জাকির নায়েক বলেছেন নারী ও পুরুষের নামাযের কোন পার্থক্য নেই। রসূল (সাঃ) কর্তৃক নারী ও পুরুষের নামায পদ্ধতিগত পার্থক্য ৩টি স্বীকৃত। (ক) নারীদের ইমাম প্রথম কাতারের মধ্যে থাকবে, সামনে যাবেনা (দারাকুৎনী হাদীস ১১৪৯২ হাসান)

(খ) নারীরা পুরুষের কাতারে দাড়াতে পারবেনা (মুসলিম মিশকাত হাদীস ১১০৮)' (গ) ইমামের ভুল হলে, ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের উপর আঘাত করে লুকমা দিবে। (মুত্তাফাক্ব আলাই/ মিশকাত হাদীস ৯৮৮) এ তিনটি পার্থক্য ছাড়া নারী ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই।(ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৯) তাছাড়া আরও কিছু পার্থক্য লক্ষনীয়- নারীরা মাথা ও পায়ের গুড়ালি ঢেকে রাখবে, ক্বিরাত নিম্ন স্বরে পড়বে নারীদের কাতার পুরুষের পেছনে থাকবে, নারী পুরুষের ইমাম হতে পারবে না, নারীরা আযান দেবে না, এবং নামায শেষে নারীরা পুরুষের আগে বের হবে। কিন্তু কাশেমী সাহেবেরা নারী পুরুষের নামাযের পার্থক্য করেছেন ১৮টি, যার প্রায় সব গুলি জয়িফ ও জাল। উক্ত ১৮ টি পার্থক্য আশরাফ আলী থানাবী (রঃ) এর বেহেস্ত জেওর ও অন্যান্য মাযহাবী ফিকহর কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে যা সম্পূর্ণ বিদ'আত।

৫নং অভিযোগ ঃ জাকির নায়েক বলেছেন নারীরা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে পারবে এটাই মুফতী কাশেমীর আপত্তি। অথচ রসূল (সাঃ) নারীরা মসজিদে যেতে চাইলে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কাসেমী সাহেবেরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে মহিলারা, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, এ্যাডভোকেট, জজ, ইউ.এনও, ম্যাজিস্ট্রেট, ডিসি এবং এসপি, সেক্রেটারী বা পাইলট, সৈনিক, পুলিশ, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, এসপি, সচিব, হয়ে একে বারে প্রধান মন্ত্রি পর্যন্ত আছে। আর ক্ষেত মজুর থেকে একেবারে ব্যাংক, বীমা, সেলসম্যান ও ক্ষুদে দোকানী পর্যন্ত নারীর কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত। মনে হয়না কোন উল্লেখযোগ্য স্থানে নারীকে বসানো বাকী আছে। তাহলে মসজিদে কেন নারীকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না? কারণটা কি? কারণ এটাই যেখানে শয়তান ঢুকতে পারেনা সেখানে নারীকেও ঢুকানো যাবে না। আর যে স্থানে অবাধে ইবলিসের বিচরণ সেখানে বেশী বেশী করে নারীর অংশগ্রহণ। আর

নামায নামক ইবাদতটি পুরুষদের জন্য সর্বজায়গায়, আর নারীদের জন্য অন্দর মহলে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় পুরুষদের জন্য সর্ব জায়গায় ফরজে আইন, আর নারীদের জন্য ফরজে কিফাইয়া। আজ যদি মুফতী কাসেমী ও ওলীপুরীরা এ ফতোয়া জারি করার সাথে সাথে আরেকটি ফতোয়া জুরে দিতেন, আর তা হল, বর্তমানে যেহেতু ফেতনার যুগ (যা হুজুর সাহেবগণ বলে থাকেন) তাই, সকল স্থানে নারীদের মসজিদ অথবা নামাযের স্থান করে দিতে হবে। যেখানে পুরুষের নামাযের স্থান রয়েছে, সেখানে নারীদের আলাদা স্থান করে নেয়া বাদ্ধতামূলক। যাতে করে নারী নামায থেকে বঞ্চিত না হয়। তাহলে উপরোক্ত ফতোয়া অনেকটা যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখ জনক হলেও সত্য, হুজুর সাবহেবগণ ফিতনার নামে প্রথমোক্ত ফতোয়া জারি করার পর দ্বিতীয় ফতোয়া জারি করার মত সৎ চিন্তা তাঁদের হৃদয়ে উদয় হয় নাই। যার ফলশ্রুতিতে নারীরা আজ নামায পড়ার পরিবেশ ও স্থান না থাকার দরুণ নামায নামক শ্রেষ্ট ইবাদত থেকে বঞ্চিত হচেছ। অথচ, রসূল (সাঃ) ও সাহাবীগণের সময় নারীরা হর হামেশা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। এমনকি, নারীরা জানাযার নামাযেও যোগদান করতেন।(ফিকহুসসুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮২)

যোগদান করেছেন ঈদগাহের নামাযেও (বুখারী) এ নারীরাই, আবার জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যোগদান করেছেন(আবুদাউদ ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫২, উসুদুল গাবা ৫ম খন্ড, পৃঃ ৫৯১, ফতুহাত-ই ইসলামিয়া, পৃঃ ৬৪)। রসূল (সাঃ) স্ত্রীদেরকে লটারির মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীদেরকে জিহাদের সফর সঙ্গী হিসাবে নিতেন। অথচ, বর্তমানে ওলীপুরী ও কাশেমী সাহেবদের ফতোয়ার কারণে নারীরা সবজায়গা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো বাংলাদেশে হানাফী মাযহাব ভিত্তিক জাতীয় মসজিদে নারীরা নামাযে যোগদান করে মুফতী কাসেমী সাহেবের ফতোয়াকে অপেক্ষা করে। মক্কা, মদীনা, মিশর, কুয়েত, ইরান, বাংলাদেশে কতিপয় মসজিদে নারীদের নামাযে যোগদানের অনুমতি রয়েছে। রসূল (সাঃ) এর অনুমতির প্রেক্ষিতেই। তাতে নারীরা নামাযে যোগদান করে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দ্বীনের ব্যাপরে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

ഇ সমাপ্ত ര